সেচপত্র

অক্টোবর-ডিসেম্বর ২০০৪

পশ্চিমবঙ্গের বন্যাপ্রবণ অঞ্চল

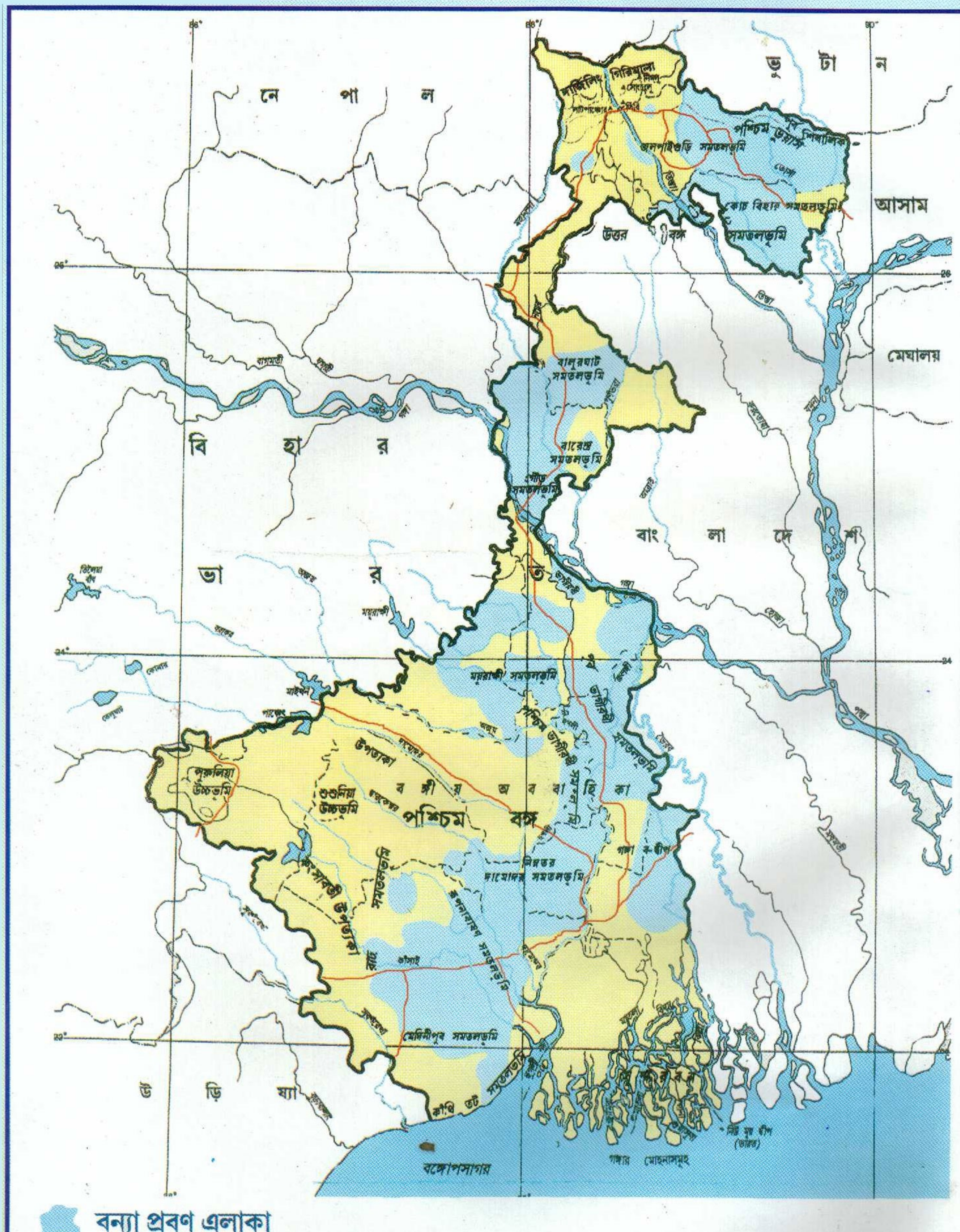

সেচপত্র

পশ্চিমবঙ্গ সরকারের সেচ ও জলপথ বিভাগের মুখপত্র

দশম বর্ষ □ অক্টোবর-ডিসেম্বর ২০০৪

সম্পাদকীয় বিভাগ

সভাপতি

গণেশচন্দ্র মণ্ডল

মন্ত্রী, সেচ ও জলপথ বিভাগ

প্রধান সম্পাদক

মৃণালেন্দু চট্টোপাধ্যায়

মুখ্য বাস্তুকার-১

সংযুক্ত সম্পাদক

প্রদীপ্ত বন্দ্যোপাধ্যায়

নির্বাহী বাস্তুকার

রাজকাপুর শর্মা

সহ-বাস্তুকার

অজয় রায়

সহ-বাস্তুকার

দিলীপ কর্মকার

অবর সহ-বাস্তুকার

শচীন দাশ

পরিসংখ্যান ও প্রকাশন সহায়ক

জলসম্পদ ভবন □ বিধাননগর, সল্টলেক

দূরভাষ : ২৩৫৮-০৫২৮ □ ফ্যাক্স : ০৩৩-২৩৩৪-৬২৪৫/২৩২১-৪৯২৮

ই-মেল : ce2iwd@cal3vsnl.net.in

ওয়েব সাইট : www.wbiwd.com

সূচীপত্র

সম্পাদকীয়

শুভেচ্ছা ❖ গণেশচন্দ্র মণ্ডল, ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রী, সেচ ও জলপথ বিভাগ, পশ্চিমবঙ্গ সরকার

পাঠকের কলম

সমুদ্রোপকূলের প্রাকৃতিক বিরূপতার প্রেক্ষাপটে ❖ জ্যোতির্ময় সরকার, মুখ্য বাস্তুকার, সেচ ও জলপথ দপ্তর ৬

শহর কলকাতা ও তার আশেপাশের নিকাশি ব্যবস্থা : অতীত ও বর্তমান ❖ অঞ্জন দাশগুপ্ত, অবসরপ্রাপ্ত মুখ্য বাস্তুকার, সেচ ও জলপথ দপ্তর ১৩

বন্যা—কিছু ভাবনা ❖ তপনকুমার রক্ষিত, নির্বাহী বাস্তুকার, সেচ ও জলপথ দপ্তর ২৪

বৃষ্টির জল সংরক্ষণ ও ব্যবহার ❖ শচীন্দ্রনাথ সাহা, অবসরপ্রাপ্ত মুখ্য বাস্তুকার, সেচ ও জলপথ দপ্তর ৩০

একটু ভেবে দেখুন ❖ উদয়ন চট্টোপাধ্যায়, নির্বাহী বাস্তুকার, সেচ ও জলপথ দপ্তর ৩১

পরিবেশ দূষণ প্রতিরোধে বিশুদ্ধিকরণ কেন্দ্রের ভূমিকা ❖ মানিক দে, উপ-অধিকর্তা, নদী বিজ্ঞান মন্দির ৩৩

বিশ্ববিচিত্রা ❖ সংকলন : অঞ্জন দাশগুপ্ত, অবসরপ্রাপ্ত মুখ্য বাস্তুকার, সেচ ও জলপথ দপ্তর ৩৬

ঐতিহ্যপূর্ণ সুন্দরবন ও তার রক্ষণাবেক্ষণ ❖ দিলীপ কর্মকার, অবর সহ-বাস্তুকার, সেচ ও জলপথ দপ্তর ৩৭

সম্পাদকীয়

'সেচপত্র' দশম বর্ষের অক্টোবর-ডিসেম্বর ২০০৪ সংখ্যাটি প্রকাশিত হল। এই সংখ্যায় আমরা কলকাতা ও আশেপাশের নিকাশিব্যবস্থা নিয়ে একটি বিস্তারিত আলোচনা রেখেছি। গোড়ার কলকাতা শহরের নিকাশি ব্যবস্থার কথা চিন্তা করে তদানীন্তন ইংরেজ সরকার নিকাশির কিছু পরিকল্পনা নিয়েছিলেন। কিন্তু কালক্রমে কলকাতা বেড়েছে এবং সেই সঙ্গে পাল্লা দিয়ে নিকাশি সমস্যার প্রকৃতিও পাল্টেছে। ক্রমাগত জনবিস্ফোরণ ও অন্যান্য কারণে নিকাশি সমস্যা আরও ভয়াবহ আকার ধারণ করেছে। সেসব সমস্যার মোকাবিলায় কী কী ধরনের ব্যবস্থা রয়েছে ও কী কী ব্যবস্থা নেওয়া হচ্ছে তাই নিয়েই এবারে রয়েছে একটি সুদীর্ঘ লেখা। সুন্দরবনে সমুদ্রোপকূলের প্রাকৃতিক বিরূপতার কারণে কীভাবে বাঁধগুলির ক্ষতি হয় এবং এ-থেকে পরিত্রাণের উপায় কী, সেসব নিয়েও একটি উল্লেখযোগ্য আলোচনা রয়েছে। রয়েছে বন্যা ও পরিবেশ দূষণ নিয়ে কিছু ভাবনা। এ ছাড়া অন্যান্য নিয়মিত বিভাগ যেমন রয়েছে তেমনি রয়েছে আরও অন্যান্য নানান তথ্য—যেগুলি পাঠকের কাজে লাগবে।

আশা করি অন্যান্য সংখ্যার মতো এ-সংখ্যাটিও সমান আকর্ষণীয় হয়ে উঠবে।

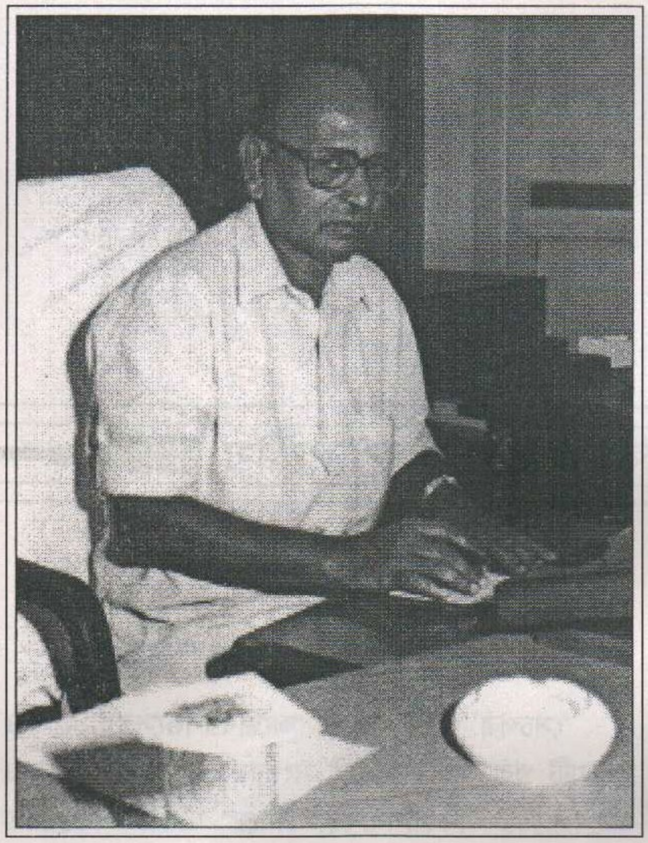

শুভেচ্ছা

পশ্চিমবঙ্গ সরকারের সেচ ও জলপথ দপ্তরের মুখপত্র '**সেচপত্র**' ১০ম বর্ষে পদার্পণ করেছে। গত ১০ বৎসর যাবৎ **সেচপত্র** পশ্চিমবঙ্গের মননশীল ব্যক্তিদের কাছে সেচদপ্তরের কাজকর্ম ও প্রযুক্তিবিদদের সুচিন্তিত মতামত পৌঁছে দিয়েছে। বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপকবৃন্দ, রাজনীতিবিদ, স্কুল ও কলেজের ছাত্র/ছাত্রীবৃন্দ, সাধারণ পাঠকের কাছে বহু অজানা দিক তুলে ধরেছে। শুধু দপ্তরের বাস্তুকার নয় তার বাইরের বাস্তুকার ও বিদগ্ধ ব্যক্তিদের লেখা ও মতামত পত্রিকার মাধ্যমে প্রকাশিত হয়েছে। এর ফলে সমস্যা ও সমাধানের অনেক গভীরে অনেককে নিয়ে গেছেন। অক্টোবর-ডিসেম্বরের ২০০৪ সংখ্যা প্রকাশের প্রাক্কালে এই পত্রিকার সাফল্য কামনা করছি।

গণেশচন্দ্র মণ্ডল
১৪/১২/২০০৪
ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রী
সেচ ও জলপথ বিভাগ
পশ্চিমবঙ্গ সরকার

পাঠকের কলম

সম্পাদক সমীপেষু,

আপনার অবগতির জন্য জানাচ্ছি, প্রায় বছরখানেক আগে আপনাদের 'সেচপত্র' পত্রিকাটি পাবার ব্যাপারে আমি আমার নাম আপনাদের পত্রিকা পাঠাবার তালিকায় নথিভুক্ত করিয়ে আসি। কিন্তু দুঃখের সঙ্গে জানাচ্ছি, এখনো পর্যন্ত কোনো পত্রিকা আজও আমি পাইনি। কাজেই অনুগ্রহ করে আমার নামটি এবারে অন্তত পত্রিকা পাঠাবার তালিকায় অন্তর্ভুক্ত করুন, কেননা আপনাদের বিভাগীয় ওই মুখপত্রটি যেমন প্রয়োজনীয় তেমনি তথ্যভিত্তিক, যা বর্তমানে আমাদের কাজে লাগছে।

আশা করি, এবারে পত্রিকাটি পাঠাবেন।

প্রীত্যন্তে—

অরুণায়ন শর্মা
অধিকর্তা
সেন্টার ফর ইকোলজিক্যাল ইঞ্জিনীয়ারিং
নেতাজী সুভাষ রোড, মালদহ

প্রিয় সম্পাদক,

পশ্চিমবঙ্গ সরকারের সেচ ও জলপথ বিভাগের মুখপত্র 'সেচপত্র' পত্রিকার কথা প্রথম জানতে পারি এপ্রিল '০৪-এ আমাদের সরকারি মহাবিদ্যালয়ের উদ্যোগে জাতীয় সেমিনার 'Disaster and its Management-perspective and future approaches'এর প্রাক্-আয়োজন পর্বে। গত ৭.৯.০৪ তারিখে জলসম্পদ ভবন থেকে সেপ্টেম্বর-অক্টোবর ২০০০, বিশেষ সংখ্যা জুন '০২, জানুয়ারি-মার্চ '০৪—এই তিনটি সংখ্যা মাত্র বিভাগীয় আধিকারিক মহাশয়ের সৌজন্যে পেয়েছি। পত্রিকার বাহ্যিক ও আভ্যন্তরীন উপস্থাপনা, গঠনশৈলী অত্যন্ত শোভন। প্রতিটি লেখনী যুক্তি ও তথ্যনিষ্ঠ এবং বর্তমান ও ভবিষ্যতের দিগ্‌নির্দেশক। ছাত্র-ছাত্রী, জ্ঞানতাপস, সমাজসেবী, বিজ্ঞানী প্রত্যেকের সহায়ক এই পত্রিকা। জনসচেতনতা প্রসারে এই পত্রিকার মূল্যবান ভূমিকা বিবেচনা করে বহুল প্রচারের জন্য উদ্যোগী হতে অনুরোধ করছি।

পরিশেষে জানাই, আমি এই পত্রিকার নিয়মিত গ্রাহক হতে চাই। আশা করি অনুরোধ বিবেচনা করে কৃতজ্ঞতাপাশে আবদ্ধ করবেন।

শুভেচ্ছান্তে—

রবীন্দ্রনাথ মন্ডল
অধ্যাপক, জু'লজি বিভাগ
কৃষ্ণনগর সরকারি মহাবিদ্যালয়

সেচপত্র নিজে পড়ুন অন্যকে পড়ান
আপনার মতামত জানান।

সমুদ্রোপকূলের প্রাকৃতিক বিরূপতার প্রেক্ষাপটে সুন্দরবন

জ্যোতির্ময় সরকার

ক. ভূমিকা

প্রকৃতির মনোরম অবদান, মানুষের আনন্দের উৎস ও জাতির অত্যাশ্চর্য সম্পদ এই সুন্দরবন। বঙ্গোপসাগরের সঙ্গমস্থলে গঙ্গা, পদ্মা, ব্রহ্মপুত্র নদীর পলি জমে জমে ছোটো ছোটো ব-দ্বীপ আকারে গঠিত, সৌন্দর্যে চমৎকার, চরিত্রে বৈচিত্রপূর্ণ এবং নানা ধরনের উদ্ভিদ ও পশুপাখি নিয়ে পৃথিবীর এই বৃহত্তম ব-দ্বীপ অঞ্চল মানচিত্রে এক বৈশিষ্ট্যপূর্ণ জায়গা করে নিয়েছে। এখানকার প্রাকৃতিক সৌন্দর্য, বৈচিত্র্যপূর্ণ উদ্ভিদ, বন্যপ্রাণী ও বেশ কিছুসংখ্যক দ্বীপে বসবাসকারী মানুষের বেঁচে থাকার লড়াইকে প্রত্যক্ষ করার আকর্ষণে পৃথিবীর বিভিন্ন প্রান্ত থেকে পরিবেশবিদ, উদ্ভিদবিদ্ ও উৎসাহী পর্যটকগণ সুন্দরবনে এসে ভিড় করেন। সাম্প্রতিক অতীতে 'ওয়ার্ল্ড হেরিটেজ সাইট' হিসেবে ঘোষিত হওয়ায় সুন্দরবনের গরিমা যেন আরও বেড়েছে। সরকারি ও বেসরকারি তরফে উপযুক্ত পৃষ্ঠপোষকতা ও প্রচার পেলে বৃহত্তর এক উৎসাহী জনগোষ্ঠীর কাছে এ বনাঞ্চলের বহুল প্রসার যে সম্ভব তাতে কোনো সন্দেহ নেই। এ বনাঞ্চলের দীর্ঘকালীন সুরক্ষা ও সৌন্দর্য রক্ষার জন্য দরকার শুধু মানুষের একটু যত্ন, সচেতনতা এবং সযত্ন রক্ষণাবেক্ষণ।

খ. উৎপত্তি ও ভৌগোলিক বৈশিষ্ট্য

পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য ও বাংলাদেশের দক্ষিণ সমুদ্রোকুলবর্তী বঙ্গোপসাগরের গা ঘেঁষে ঝালরের মতো বিশাল অংশই হল সুন্দরবন। সুন্দরবন প্রকৃতপক্ষে, পশ্চিমে হুগলি ও পূর্বে পদ্মা-মেঘনা নদী প্রণালী দ্বারা বেষ্টিত গঙ্গা ও ব্রহ্মপুত্র নদীবাহিত জমে ওঠা পলি দ্বারা গঠিত এক বিশাল গাঙ্গেয় ব-দ্বীপের সমষ্টি। এর দক্ষিণে বঙ্গোপসাগর, উত্তরে ড্যাম্পিয়ার হজেসলাইন, যা পূর্বে বসিরহাটের দিক থেকে আঁকাবাঁকা লাইন ধরে এসে পশ্চিমে কুলপিতে এসে শেষ হয়েছে। সুন্দরবনসহ দক্ষিণবঙ্গের বেশিরভাগ অংশই সৃষ্টি হয়েছে শতাধিক বছর ধরে গঙ্গা ও ব্রহ্মপুত্র অববাহিকার নিম্নখাত ধরে নেমে আসা লক্ষ লক্ষ মিলিয়ন টন পলি আসার কারণে এবং ব-দ্বীপগুলিও গঠিত হয়েছে সাগর সঙ্গমে পলি জমে জমে। নদীর মোহনামুখি শক্তিশালী স্রোত সমুদ্রের বিপরীতমুখী বাতাসের সংস্পর্শে এসে ক্রমাগত বাঁধা পেয়ে পেয়ে ব-দ্বীপের জমি গঠন করেছে। ব-দ্বীপ সৃষ্টিকারী অন্যান্য নদীর মতো গঙ্গা সমুদ্রাভিমুখে যাওয়ার সময় বহুমুখী শাখা-প্রশাখায় বিভক্ত হয়ে ইতিমধ্যেই তৈরি হওয়া ব-দ্বীপগুলিকে ছেদ করে ক্রমাগত পলি নিয়ে এসে সমুদ্রের কাছে আরও ব-দ্বীপ নির্মাণে সাহায্য করেছে। প্রবাহগুলির মুখের কাছে জমতে থাকা বিশাল পরিমাণে জমাট না-বাঁধা পলি জোয়ারের সময়ে, বছরভর দিনে দুবার করে ভূ-খণ্ডের দিকে আসতে থাকে এবং ওই পলির কিছু অংশ ভাটার সময়ে সেখানে রেখে যায়, যেগুলি সহজেই ব-দ্বীপ গঠনে মুখ্যভূমিকা গ্রহণ করে। হিমালয়ের খাড়া ঢালের পাশাপাশি তরাই অঞ্চলের বৃষ্টিপাতের চরিত্রানুযায়ী বর্ষার মরশুমে পলি সরবরাহের আধিক্য বেড়ে যাওয়ায় ব-দ্বীপ নির্মাণের প্রক্রিয়া খুবই দ্রুতহারে বাড়তে থাকে। দ্রুত ব-দ্বীপ গঠনের আর একটি গুরুত্বপূর্ণ কারণ হল, বঙ্গোপসাগরের ফানেলাকৃতি মুখের কারণে তৈরি হওয়া এক অস্বাভাবিক উচ্চ জলতল যা বছরভর দিনে দুবার করে ব-দ্বীপগুলির ওপরে পলি ছড়িয়ে দিতে সাহায্য করে।

দ্বাদশ শতাব্দী পর্যন্ত দক্ষিণবঙ্গে ব-দ্বীপের এই গঠন প্রক্রিয়া খুব দ্রুত হারে

নদীর ওপরে ভাসমান জলযান। *ছবি : দিলীপ কর্মকার*

হতে থাকে। কিন্তু দ্বাদশ ও ষোড়শ শতাব্দীর মাঝামাঝি গঙ্গার প্রধান ধারা ভাগীরথী-হুগলি ও পদ্মার মধ্যে ওঠানামা করে এবং ষোড়শ শতাব্দীর পরবর্তীকাল থেকে পূর্ব প্রবাহিনী পদ্মা-ই প্রধান ধারা হিসেবে দেখা দেয়। প্রধান ধারার এই ভিন্নমুখিতার কারণে গঙ্গা-ভাগীরথী-হুগলি নদী প্রণালীর সমস্ত শাখাগুলি যারা আগে প্রতিনিয়ত পলি বহন করে আনত তারা বর্ষা মরশুম ছাড়া অন্যান্য সময়ে আর উচ্চ অঞ্চলের জল বহন ক্ষমতা হারিয়ে ফেলছে। ফলে এ সমস্ত নদী ও খাড়িগুলি ব-দ্বীপ নির্মাণে অক্ষম হয়ে পড়ে হুগলি নদী ব্যতীত পুরোনো নদী ও খাড়িগুলি স্থানীয় জলগ্রহ ক্ষেত্রের নিকাশি বহনকারী জোয়ারের খাড়িরূপেই থেকে গেছে।

সুন্দববনের মোট আয়তন ২.০৭ মিলিয়ন হেক্টর। যার মধ্যে কেবলমাত্র ০.৭৯১ মিলিয়ন হেক্টর ভারতবর্ষের মধ্যে আছে। বাকিটা বাংলাদেশে অবস্থিত। আমাদের আলোচনার বিষয় অবশ্যই ভারতবর্ষের অন্তর্ভুক্ত সুন্দরবনকে নিয়ে। মোট ৭৯১০ বর্গ কিমি আয়তনবিশিষ্ট আমাদের সুন্দরবনের মধ্যে ৪১৭০ বর্গ কিমি অঞ্চল খাড়ি, খাল, নদীনালাসহ সংরক্ষিত বনভূমি এবং বাকি ৩৭৪০ বর্গ কিমি অঞ্চল জঙ্গল এলাকা থেকে উদ্ধার করে সেই উদ্ধারকৃত জমির ২৫৯০ বর্গ কিমি এলাকাকে চাষযোগ্য জমিতে রূপান্তরিত করা হয়েছে এবং এই জমিকেই রক্ষার জন্য ৩৫০০ কিমি প্রান্তিক বাঁধ দিয়ে ঘিরে রাখা হয়েছে। বাকি ১১৫০ বর্গ কিমি জঙ্গলবিহীন বাসযোগ্য অঞ্চলের মধ্যে ৮৯১ বর্গ কিমি অঞ্চলে আছে ভূ-জল এবং অবশিষ্ট ২৫৯ বর্গ কিমি অঞ্চল অ-বাসযোগ্য তটভূমি এলাকা অথবা নুতন তৈরি হওয়া নীচু দ্বীপ।

গ. ভূ-সংস্থান

উপরের অঞ্চলের বন্যার জল নামা'ও জোয়ার-ভাটার কারণে নদীতীরের সর্বাধিক কাছাকাছি অঞ্চলে পলির গভীরতা বেশি হয়, যেখানে নদীর বেগ প্রথমে বাধা পায় এবং প্লাবনের জল যত ব-দ্বীপের ভেতরে প্রবেশ করে জলের গতিবেগ কমার সঙ্গে সঙ্গে পলির গভীরতাও কমে যায়। দুই বন্যাবহনকারী প্রবাহের মাঝামাঝি অঞ্চল দুই নদীতীরের তুলনায় হয়ে পড়ে নীচু। কিন্তু জোয়ারের অবিরত আসা-যাওয়ার কারণে অজমাট পলি ক্রমাগত সমস্ত অববাহিকায় ছড়িয়ে পড়ায় ভেতরের নীচু অংশ ক্রমশ উঁচু হয়ে তীরভূমির সমান উচ্চতা ধারণ করে। ফলে সাধারণ ভূ-গঠন খুবই সমতল হয়ে পড়ে। যেহেতু দ্বীপগুলি গঙ্গা ও তার শাখাগুলির বহনকারী পলি দ্বারা গঠিত সে কারণে জমি এখানে খুবই উর্বর।

ঘ. নদী প্রণালী

সুন্দরবনের সমগ্র এলাকাই একটা জটিল জালের মতো, যেখানে আছে পরস্পরছেদি অসংখ্য ছোটবড় নদীনালা-খাড়ি এবং যেগুলি সুন্দরবনের সমস্ত অঞ্চলকে অনেকগুলি দ্বীপে বিভক্ত করেছে। এই সমস্ত খাল ও খাড়িগুলি কিছু নদী ও প্রধান খাড়ির মাধ্যমে প্রবাহিত হয়ে শেষ পর্যন্ত বঙ্গোপসাগরে গিয়ে মিশেছে। পশ্চিম থেকে পূর্বে এগুলি নিম্নরূপ :

১. হুগলি :

ফরাক্কা ব্যারেজের মাধ্যমে গঙ্গার আংশিক প্রবাহ ছাড়াও পশ্চিমের নদীগুলি যেমন ময়ূরাক্ষী, অজয়, রূপনারায়ণ, দামোদর ইত্যাদির বৃষ্টির জল বহন করে।

২. বড়তলা অথবা মুড়িগঙ্গা :

হুগলি নদীরই একটি শাখা। ভাগীরথী-হুগলির ১৬ শতাংশ প্রবাহ বহন করে নিয়ে এসে মূল সুন্দরবন থেকে সাগর দ্বীপকে আলাদা করেছে।

৩. সপ্তমুখী :

শুধুমাত্র জোয়ারসমৃদ্ধ বড় খাড়ি।

৪. ঠাকুরাণ :

শুধুমাত্র জোয়ারসমৃদ্ধ বড় খাড়ি।

৫. মাতলা :

আগের কলকাতা শহরের বর্জ্য ও বৃষ্টির জল বহনকারী বিদ্যাধরী নদী বর্তমানে মৃত। প্রকৃতপক্ষে বিদ্যাধরীই মাতলা নদীর উপরের অংশ। বর্তমানে এটি একটি জোয়ার-ভাটার নদী।

৬. গোসাবা :

কেবলমাত্র জোয়ার-ভাটার নদী।

৭. হেরোভাঙা :

কেবলমাত্র জোয়ার-ভাটার নদী।

৮. রায়মঙ্গল :

আগে গঙ্গার শাখানদী যমুনার মাধ্যমে গঙ্গার উজানের প্রবাহ ধারণ করাই ছিল এই নদীর ভূমিকা। কিন্তু ষোড়শ শতাব্দী থেকে যমুনা গঙ্গা থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে যাওয়ায় রায়মঙ্গল প্রধানত এখন একটি জোয়া-ভাটার নদী।

সাধারণত পশ্চিমবঙ্গের সমস্ত প্রধান নদীই দক্ষিণদিকে প্রবাহিত হয়ে সমুদ্রের দিকে ধাবিত হয়েছে। এদের মধ্যে কোনো কোনোটি একাধিক শাখায় বিভক্ত হয়ে সমুদ্রে মিশেছে।

বড় বড় নদী ও খাড়িগুলির মাঝে অসংখ্য জলস্রোত ও জলবাহী নালা আছে যেগুলি খাল নামে পরিচিত হয়ে জালের মতো খাড়ির সৃষ্টি করেছে। আবার কিছু জলস্রোত শেষ হয়েছে ছোটো খালেই, যেগুলি প্রতিটি দ্বীপের অতিরিক্ত বৃষ্টির জমা জল টেনে নেয়। এ সমস্ত ছোটো খালগুলি বৃষ্টির জল বহন করে নিয়ে গিয়ে বড় খালে ফেলে এবং শেষ পর্যন্ত ভাটার সময়ে নদীমোহনা ধরে সমুদ্রের দিকে চলে যায়। পাশাপাশি, জোয়ারের সময়ে যখন জল স্ফীত হয়ে ওঠে, এ সমস্ত খাল বড় খাল ও নদীর মাধ্যমে ওই জোয়ারের জল বহন করে, ফলে তাদের জলতলের উচ্চতা বেড়ে যায়। এই খালগুলি বড় না হওয়ার কারণে জোয়ারের জল খালের দুই প্রান্ত অতিক্রম করে স্থলভূমিতে প্রবেশ করে। কিছু ছোটো খাল আছে যা দুটি বড় খাল বা খাড়িকে সংযুক্ত করে। এ ধরনের খালকেই বলা হয় 'দোয়ানিয়া খাল'। সুন্দরবনের বিভিন্ন অংশে এসব খালের মাধ্যমে মানুষের যাতায়াতের সুযোগসুবিধার পাশাপাশি জিনিসপত্রও আনা নেওয়ার কাজও সুষ্ঠুভাবে করা হয়।

ঙ. জোয়ার-ভাটার ভূমিকা

সুন্দরবনের ব-দ্বীপ নির্মাণের প্রক্রিয়ায় জোয়ার-ভাটার ভূমিকা গুরুত্বপূর্ণ। পৃথিবীর উপর চন্দ্র ও সূর্যের যৌথ আকর্ষণের কারণেই সমুদ্রে স্থিতি ও গতিশক্তির জন্ম নেয়। প্রথমোক্ত শক্তিই জোয়ারের জলতলের উচ্চতা বৃদ্ধির কারণ এবং তার ফলে জোয়ারের জল সামুদ্রিক নদীগুলিতে বইতে শুরু করে ও দ্বিতীয়োক্ত শক্তি জলস্রোতের গতি সঞ্চার করে। জোয়ারের সময়ে জোয়ারের জল স্ফীত হয়ে যখন প্রচুর পরিমাণে পলি নিয়ে নদীমুখে ঢোকে তখন জলস্রোতের গতি খুবই বেশি থাকে। এটা সত্যি যে, জোয়ার-ভাটার নদীতে জোয়ারের তুলনায় ভাটা দীর্ঘস্থায়ী হয় এবং ভাটার গতিও জোয়ারের তুলনায় অনেক কম থাকে। ফলে ভাটায় জোয়ারের সময়ে ঢোকা ওইসব পলি আর পুরোপুরি ফিরে আসতে পারে না এবং কিছু মাত্রায় পলি উচ্চ জলের

শিথিলতা ও নিম্ন জলের শিথিলতার সময়ে তাদের থিতু হবার জায়গা করে নেয়। জোয়ারের সময়ে সর্বোচ্চ জলতলকে 'এইচ. ডবলু. এল' (H W L) ও ভাটার সময়ে সর্বনিম্ন জলতলকে 'এল. ডবলু. এল' (L W L) বলা হয়। এই দুটি জলতলের পার্থক্যকে বলা হয় 'জোয়ার-ভাটার আভোগ' (Tidal Range) এবং এই দুটি সর্বোচ্চ বা সর্বনিম্ন জলতল ঘটার মধ্যবর্তী সময়কে বলা হয় 'জোয়ার-ভাটা আবর্তনের সময়' (Period of Tidal Cycle) যার একটা গড় হিসেব পাওয়া যায় ১২ ঘণ্টা ২৪ মিনিট।

জোয়ারের আর একটি মজার ব্যাপার হল, যে কোনো জায়গাই জোয়ার-ভাটার আভোগ চান্দ্রপক্ষ অনুযায়ী সবসময়েই বিভিন্ন দিনে একটি সমতায় ওঠানামা করে। পূর্ণিমা ও অমাবস্যায় চান্দ্রপক্ষকালে জোয়ার-ভাটার আভোগ সর্বাধিক হয় এবং একেই বলা হয় 'ভরা কোটাল'। আবার জোয়ার-ভাটার আভোগ ক্রমশ হ্রাসপ্রাপ্ত হতে হতে চান্দ্রপক্ষকালের মাঝামাঝি সময়ে যখন সবনিম্ন অবস্থায় পৌছায় তাকে বলে 'মরা কোটাল'। জোয়ার-ভাটার এই ক্রমাগত প্রতিক্রিয়াই সমুদ্রোমুখী নদীর মুখে পলির আস্তরণ ফেলে চলে ও যেগুলি ক্রমশ বড় ও প্রসারিত হয়ে এক সময়ে দ্বীপে পরিণত হয়।

চ. মানুষের হস্তক্ষেপ ও উদ্ভূত সমস্যাবলী

বৃটিশ শাসনের আগে পর্যন্ত সমস্ত সুন্দরবন নাকি ঘন অরণ্যে ঢাকা ছিল। কিন্তু বিভিন্ন দ্বীপে খনন ও পরীক্ষা-নিরীক্ষা চালিয়ে এমন সাক্ষ্য-প্রমাণও পাওয়া যায় যে, সুদূর অতীতে এখানে মনুষ্য বসতি ও সভ্যতা ছিল। অনুমান করা যায়, ভয়ঙ্কর প্রাকৃতিক ঝড়, দুর্ভিক্ষ-মহামারী ও বাইরের আক্রমণে ওই সভ্যতা ও বসতি ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়। যাই হোক, বর্তমান নথিপত্র থেকে যা পাওয়া যায় তাতে দেখা যায়, অষ্টাদশ শতাব্দীর মধ্যবর্তী সময় পর্যন্ত এই অঞ্চল ঘন অরণ্যে আবৃত ছিল। ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির উৎসাহে ১৭৭০ সালে কিছু বেসরকারী উদ্যোগী কলকাতার কাছাকাছি অবস্থিত বেশ কিছু দ্বীপের পত্তনিস্বত্ব প্রাপ্তির আগেই ওইসব ভূখণ্ডের উর্বরতায় প্রলুব্ধ হয়ে জঙ্গল কেটে, নীচু জায়গাকে জোয়ারের জলের হাত থেকে বাঁচাবার জন্য প্রান্তিক বাঁধ দিয়ে ঘিরে দেয়। আর সেদিন থেকেই সুন্দরবনে শুরু হয় এক ক্ষতিকর ও অবিবেচনাপূর্ণ হস্তক্ষেপের থাবা। পরবর্তীকালে জঙ্গল ধ্বংস করে বহু অগঠিত দ্বীপে সম্পূর্ণ অবৈজ্ঞানিক ও পরিকল্পনাহীনভাবে জমি পুনরুদ্ধারের কাজ চলতে থাকে এবং প্রায় ১৩৯ বছর ধরে কিছু বসবাসকারী ও কায়েমী স্বার্থবাদী ব্যক্তি তাদের নিজেদের স্বার্থে এই কর্মকাণ্ড চালিয়ে যায়। ১৯০৯ সালে কলকাতার অববাহিকা ও তার উপকণ্ঠে বিদ্যাধরী নদী প্রণালীর অবনতির ফলে নিকাশি ব্যবস্থা বাধা পাওয়ায় ব্যাপারটি বৃটিশ সরকারের নজরে আসে। ওই বছরই সুন্দরবনে যথেচ্ছভাবে জঙ্গল কেটে নুতন জমি পুনরুদ্ধারের উপর নিয়ন্ত্রণ জারি করে একটি সরকারি আদেশনামা বেরোয়। সুন্দরবনে ভূ-স্বামীরা যে সমস্ত বাঁধ তৈরি করেছিল সেগুলি ছিল খুবই দুর্বল, অপরিকল্পিত ও নিরাপত্তাহীন। নদীর কিনারা ঘেঁষে, এমনকি যেখানে নদী ধনুকের মতো বাঁক নিয়েছে সেখানেও উপকূলের কোনো চরজমি না ছেড়েই বাঁধ নির্মাণ করা হয়েছে। দ্বীপের ভেতরের নিকাশির কোনো ব্যবস্থাও রাখা হয়নি। পরবর্তীকালে ওই নিকাশি ব্যবস্থার জন্য কিছু ছোটো কাঠের বাক্সো বসিয়ে অবশ্য নিকাশি প্রণালীর উন্নতি করার চেষ্টা হয়, কিন্তু সেটাও নিকাশি সম্পর্কিত জলগ্রহ ক্ষেত্রের নিকাশি ব্যবস্থায় খুবই অপর্যাপ্ত। বাঁধগুলি উচ্চতায় খুবই ছোটো ও যথেষ্ট প্রশস্ত ছিল না, ফলে ভরা কোটালের জোয়ারের জলের চাপ পর্যন্ত সেগুলি সহ্য করতে অক্ষম হয়ে পড়ে। জল উপচে বাঁধ ভাঙা ও ঢেউয়ের আঘাতে বাঁধ উড়ে যাওয়া তাই তখন খুবই সাধারণ ঘটনা ছিল। কেবল তাইই নয়, ঝড়ের গতি কম হলেও ঢেউয়ের চাপে এখানে বাঁধ ভেঙে যেত এবং খেতে নোনা জল ঢুকে ধান নষ্ট হওয়ায় স্থানীয় মানুষের দুর্ভোগের কারণ হত। সাধারণত দ্বীপের নিকাশি নালাগুলি যেগুলি বাঁধ কেটে করা হত সেগুলির সময় মতো সঠিক মেরামতি না করায় প্রায়ই সে-সমস্ত কাটা অংশ দিয়ে জল ঢুকে বাঁধ ভেঙে যেত। জঙ্গল ধ্বংস করে এরকম তৈরি না-হওয়া জমির পুনরুদ্ধারের বিরুদ্ধে যখন বিধিবদ্ধ আইন তৈরি হচ্ছিল সেই সময় তদানীন্তন সরকারের কাছে দুটি বিকল্প রাস্তা খোলা ছিল। হয় অগঠিত দ্বীপগুলিতে, নদীর কিনারা ঘেঁষে তৈরি হওয়া সমস্ত বাঁধগুলিকে কেটে ফেলে জোয়ারের জলকে স্বাভাবিকভাবে খেলতে দিয়ে পূর্ণ উচ্চতায় আনা, অথবা যে-সমস্ত জমির পুনরুদ্ধার হয়েছে সেগুলি বাদ দিয়ে নতুন করে জঙ্গল ধ্বংস করে জমির পুনরুদ্ধার একবারে বন্ধ করা। কিন্তু দ্বীপগুলিতে স্থায়ীভাবে বসবাসকারী মনুষ্যবসতি সরানো অস... বলে ও ...

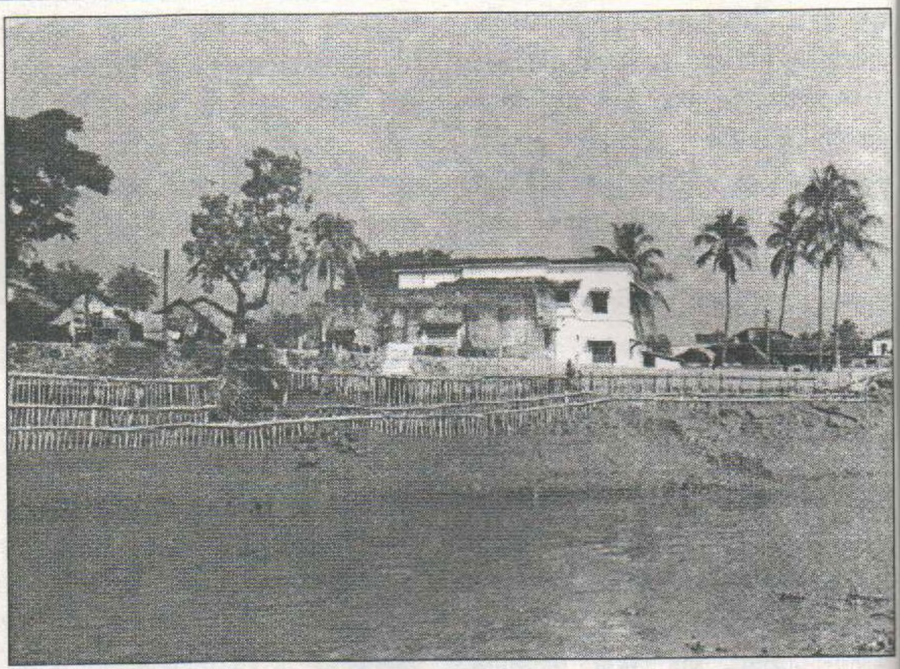

জোয়ার-ভাটার নদীতে পলি জমছে অনবরত ছবি : দিলীপ কর্মকার

কারণে প্রথমটি করা সম্ভব ছিল না। দ্বিতীয়টি তাই তদানীন্তন সরকার গ্রহণ করেছিল। কিন্তু দুর্ভাগ্যবশত বাঁধের গঠনের উন্নতি ও নিকাশি ব্যবস্থা স্থাপনের লক্ষে সরকার বা ভূস্বামীদের দিক থেকে বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গীসহ কোনো বিশেষ প্রক্রিয়া গ্রহণ করতে দেখা যায়নি।

ছ. সুন্দরবনের বন্যা ও প্রাকৃতিক দুর্যোগের প্রভাব

(১) বৃষ্টিপাত :

সুন্দরবনের গড় বার্ষিক বৃষ্টিপাত ১৬২৫ মিলিমিটার। কোনো কোনো অস্বাভাবিক বছরে এটা ২০০০ মিলিমিটারও ছাড়িয়ে যায়। আবার কখনো কোনো অস্বাভাবিক বছরে এটা ১৩০০ মিলিমিটারেরও কম হতে দেখা গেছে। জুন মাসের দ্বিতীয় সপ্তাহেই সাধারণত দক্ষিণ-পশ্চিম মৌসুমি বায়ু বইতে শুরু করে এবং অক্টোবরের মাঝামাঝি ফিরে যায়। কোনো কোনো বর্ষার মরশুমে প্রচন্ড বৃষ্টিপাতের প্রবণতা লক্ষ করা যায়।

(২) তাপমাত্রা ও আর্দ্রতা :

সুন্দরবনের সর্বাধিক ও সর্বনিম্ন তাপমাত্রা মে ও জানুয়ারি মাসে যথাক্রমে ৩২ ডিগ্রি ও ১৩.৭ ডিগ্রি সেন্টিগ্রেড। ফেব্রুয়ারির গোড়া থেকেই তাপমাত্রা বাড়তে থাকে এবং অক্টোবরের মাঝামাঝি কমে যায়। মার্চ মাসের মাঝামাঝি দক্ষিণা বাতাস বইতে শুরু করে ও উত্তর-পশ্চিম বায়ুজনিত ঝড়ের আগমন ঘটে এপ্রিল ও মে মাসে। আর্দ্রতা ওঠানামা করে প্রায় ৮৬ শতাংশ থেকে ৭৫ শতাংশ পর্যন্ত।

(৩) বন্যার প্রভাব :

আগেই বলা হয়েছে একরকম তৈরি না হওয়া জমির পুনরুদ্ধারের কারণে সুন্দরবনের দ্বীপগুলির জমির গড় সমতল জোয়ার-জলের উচ্চতার তলের তুলনায় ১.৫৫ মিটার থেকে ০.৭৫ মিটার নীচে থাকে এবং সামুদ্রিক এলাকাতে জমির তল উচ্চ-জলতলের প্রায় ২.৬০ মিটার নীচে থাকে। বর্তমানে সুন্দরবনের মোট ৫৪টি দ্বীপে ০.২৫৯ মিলিয়ন হেক্টর এলাকাতে মানুষ বসবাস করে এবং এই এলাকাকে ঘিরেই আছে মোট ৩৫০০ কিলোমিটার নদীবাঁধ। ১৯৫৫ সালে এস্টেট অ্যাকুইজিসান অ্যাক্ট অনুযায়ী এই সমস্ত বাঁধগুলির রক্ষণাবেক্ষণের দায় পশ্চিমবঙ্গ সরকারের ওপর বর্তায়। বাঁধগুলি যথাযথভাবে দেখাশোনা করা ও রক্ষণাবেক্ষণের জন্য কারিগরি দিকের কথা বিবেচনা করে এই রক্ষণাবেক্ষণের দায়িত্ব এরপর চলে আসে পশ্চিমবঙ্গ সরকারেরই সেচ ও জলপথ বিভাগের ওপর। এ সমস্ত বাঁধগুলি বর্তমানে সুন্দরবনের মনুষ্যবসতিপূর্ণ দ্বীপগুলির প্রাণভোমরা—কেননা এই বাঁধগুলির স্থায়ীত্বের ওপরই সুন্দরবনের মানুষের শস্য ও সম্পদের নিরাপত্তা নির্ভর করে। কিন্তু অনেকগুলি দ্বীপে বিস্তৃত এত দীর্ঘ বাঁধগুলির রক্ষণাবেক্ষণ খুবই কঠিন কাজ। আর দুর্গম অঞ্চলে অবস্থিত নদীবাঁধগুলি প্রথমিক নির্মাণের সময় ত্রুটিজনিত কারণে রক্ষণাবেক্ষণ আরো কঠিন হয়ে পড়েছে।

সত্যি বলতে কী, সুন্দরবনের দ্বীপগুলির বন্যা সাধারণত স্বাভাবিক বন্যার মতো নয়। ভাগীরথী ও তার শাখা নদীগুলির মাধ্যমে উচ্চ জলগ্রহক্ষেত্রের বন্যার জল সুন্দরবনের নদী ও খাঁড়িগুলিতে ঢুকে পড়লেও সেগুলি তেমন প্রভাব বিস্তার করতে পারে না। কেননা অসংখ্য নদী ও খাঁড়ি থাকার কারণে জল বিপুল গতিতে সমুদ্রে গিয়ে পড়ে। কিন্তু আসল ভয়টা হল এ-অঞ্চলের জোয়ারের ভূমিকা। বর্ষার মরশুমে যদি দ্বীপগুলিতে দীর্ঘসময় ধরে অস্বাভাবিক বৃষ্টি হয় এবং সে বৃষ্টিপাতের সঙ্গে যদি ভরা কোটালের সংযোগ ঘটে যায় তাহলে যতক্ষণ না ভরা কোটাল সরে যায় ততক্ষণ কিছুদিনের জন্য জলগ্রহ ক্ষেত্রটি জলে নিমগ্ন থাকে। অনুরূপ পরিস্থিতির সৃষ্টি হয় যখন ভাগীরথী ও হুগলি নদী প্রণালীর উচ্চ জলগ্রহক্ষেত্র থেকে প্রচুর পরিমাণে বৃষ্টির জল নেমে এসে বর্ষা মরশুমের ভরা কোটালের সঙ্গে সংযোগ ঘটায়। এসব ক্ষেত্রে ওই সময়ে উচ্চ জলের তল প্রায়ই অনুমিত উচ্চ-জোয়ারের জলতলকে ছাপিয়ে যায়, ফলে দ্বীপগুলি অস্থায়ীভাবে ডুবে গিয়ে বন্যার কারণ ঘটায়। এমন পরিস্থিতিতে কোনো কোনো জায়গায় যেখানে উচ্চতা অপেক্ষাকৃত কম, সেখানে উচ্চজলতল বাঁধ টপকে বাঁধে ফাটল ধরায় ও দ্বীপে বন্যা নিয়ে আসে। কিন্তু এরকম ঘটনা খুব কমই ঘটে।

(৪) প্রাকৃতিক দুর্যোগের প্রভাব :

সুন্দরবনের দ্বীপগুলির সত্যিকারের বিপদ হল ঘূর্ণিবাত্যা, ঝড় ও ভূমিকম্প। সুন্দরবনে ঝড় একটি অতি সাধারণ ঘটনা এবং সাধারণত বছরে দুবার করে ভয়ংকর আকারে সে আঘাত হানে। এ ধরনের ঝড়ের কারণ বঙ্গোপসাগরের নিম্নচাপ ও ঈষৎ ভেজা শক্তিশালী বাতাসের প্রকোপ। এপ্রিল থেকে নভেম্বর মাসের মধ্যে সাধারণত যখন দক্ষিণ-পশ্চিমী বাতাস সাগরের ওপর দিয়ে বইতে শুরু করে তখনই এমন ঝড়ের উৎপত্তি হয়। কিন্তু অক্টোবর মাসে এই ঝড়ের উৎপত্তির আশঙ্কা সব থেকে বেশি। বায়ুর চাপের গভীরতা ও বাতাসের ব্যাপ্তি এ ধরনের ঝড়কে প্রভাবিত করে। কিছু ঝড় ছড়িয়ে পড়ে বহুদূর পর্যন্ত ব্যাপ্তি নিয়ে, কিন্তু তার চাপের নতিমাত্রা থাকে খুবই কম, আবার কোনো কোনো ঝড় হয়তো তার ক্ষুদ্র ব্যাপ্তির মধ্যে গভীর চাপের নতিমাত্রা নিয়ে অনেক বেশি সংঘবদ্ধ হয়ে থাকে। পূর্বোক্ত ঝড়টি অনেক দূর ছড়িয়ে পড়লেও ক্ষয়ক্ষতির পরিমাণ থাকে কম, কিন্তু শেষোক্ত ঝড়টি সীমাবদ্ধ অঞ্চলের মধ্যে ব্যাপক ক্ষয়ক্ষতি নিয়ে আসে। কেন্দ্রীয় আবহ দপ্তর ঝোড়ো বাতাসের গতিবেগ যেভাবে শ্রেণিবদ্ধ করেছেন তা নিম্নরূপ :

ক্রমিক	ঝড়ের আকার		বাতাসের গতিবেগ
১.	নিম্নচাপ অঞ্চল	=	১৭ নটের বেশি নয়
২.	নিম্নচাপ	=	১৭ থেকে ২৭ নট
৩.	গভীর নিম্নচাপ	=	২৮ থেকে ৩৩ নট
৪.	ঘূর্ণিঝড়	=	৩৪ থেকে ৪৭ নট
৫.	তীব্র ঘূর্ণিঝড়	=	৪৮ থেকে ৬৩ নট
৬.	তীব্র ঘূর্ণিঝড়ের সঙ্গে প্রবল ঝঞ্ঝা (হ্যারিকেন)	=	৬৪ নট ও তদ্ধোর্ধ *

*(১ নট = ১.৮৫ কিমি / ঘণ্টা)

বাতাসের উচ্চচাপ ও তজ্জনিত ঢেউয়ের প্রভাব নদী ও খাড়িগুলির জলতলকে অনেক স্ফীত করে যা জোয়ারের প্রভাবে আনুমানিক উচ্চ জলতলের চেয়ে অনেক বেশি পরিমাণে স্ফীত হয়ে ওঠে। বাতাসের প্রবল গতিতে তৈরি হওয়া বড় বড় ঢেউ বাঁধের গায়ে প্রচণ্ড জোরে ধাক্কা মারে এবং তারই ফলে মাটির বাঁধগুলি বিপুল পরিমাণে ক্ষতিগ্রস্ত হয়। উচ্চগতির বাতাসের প্রভাবে নদী ও খাড়িগুলিতে যে বৃহৎ ঢেউগুলি ঢোকে সেগুলি যেন আরো বড় ও উঁচু হয়ে বাঁধগুলির দিকে ছুটে যায় এবং আছড়ে পড়ে বাঁধের ঢালের গায়ে। ফলে বাঁধ টপকে জল ঢোকে ও বাঁধ ভেঙে যায়। আর ভরা কোটালের সময়ে তীব্র ঘূর্ণিঝড় কোটালের সঙ্গে মিশে গেলে ভয়ঙ্কর রকম ক্ষয়ক্ষতি হয়। এখানেও জোয়ার একটা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা গ্রহণ করে থাকে। ঘূর্ণিঝড় ও তার প্রভাবে নদী ও খাড়িগুলিতে জলতলের উচ্চতা জলবিজ্ঞানের দিক থেকে খুবই গুরুত্বপূর্ণ, কেননা এগুলির প্রভাবেই স্থির করে কতটা উচ্চতা পর্যন্ত জল উঠতে পারে ও কতটা উচ্চতা পর্যন্ত বাঁধ সংরক্ষণের কাজ করা উচিত। এখন পর্যন্ত নথিপত্র থেকে যে তথ্য পাওয়া যায় তাতে ১৯৪২ সালের অক্টোবর মাসেই সবচেয়ে বড় ও ভয়ংকর ঘূর্ণিঝড়টি এখানে আছড়ে পড়ে এবং পশ্চিমবঙ্গের সমুদ্রোপকূলবর্তী অঞ্চলেই সবচেয়ে বেশি ক্ষয়ক্ষতি হয়। সাগরদ্বীপে প্রতিঘণ্টায় ১৬৫ কিমি বেগের ঝড়ই সুন্দরবনে সর্বাধিক নথিভুক্ত ঝড়ের রেকর্ড। আর অনুমিত সর্বোচ্চ জলতলের তুলনায় এসময় জলতলের সর্বাধিক উচ্চতা পাওয়া যায় প্রায় ৩.৫০ মিটার বেশী যা বিগত সময়ের নথিভুক্ত ঝড়ের রের্কডের সর্বোচ্চ জল সমতলের তুলনায় ২ মিটার বেশি। সুন্দরবনের সমুদ্রোপকূলে যে সমস্ত বছরগুলিতে ভয়ঙ্কর ঘূর্ণিঝড় দেখা যায় সেগুলি হল :

১৯০১, ১৯০৪, ১৯০৯, ১৯১৩, ১৯১৬, ১৯১৭, ১৯১৯, ১৯২২, ১৯২৭, ১৯২৮, ১৯২৯, ১৯৩২ ১৯৩৪, ১৯৩৫, ১৯৩৬, ১৯৩৭, ১৯৪০, ১৯৪১, ১৯৪২, ১৯৪৩, ১৯৪৮, ১৯৫৬, ১৯৬০, ১৯৬১, ১৯৬৫, ১৯৬৮, ১৯৭০, ১৯৭৩, ১৯৮১, ১৯৮২, ১৯৮৬, ১৯৮৮, ১৯৯১, ১৯৯৫, এবং ১৯৯৯।

বেশির ভাগ ঘূর্ণিঝড়গুলি বছরের বিভিন্ন মাসে উপকূল অতিক্রম করে ঘণ্টায় ২৫ থেকে ৭৫ কিমি বেগে। এ সমস্ত ঘূর্ণিঝড়গুলি পশ্চিমবঙ্গের উপকূলবর্তী অঞ্চলের ভাঙন ও ক্ষয়ের জন্য দায়ি। এর প্রভাবেই কোনো কোনো সমুদ্রোকূলবর্তী অঞ্চলের বালি জমা ও বালিয়ারির সৃষ্টি হয়। এ ধরনের ঘূর্ণিঝড় সুন্দরবনের ম্যানগ্রোভ ও সংরক্ষিত বনাঞ্চলের ওপর বিরূপ প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করে।

(৫) ভূমিকম্পের প্রভাব :

সুন্দরবনের দ্বীপগুলিতে ভূমিকম্পের প্রভাব বড়োই বিপজ্জনক। ভূমিকম্প এসব অঞ্চলে সাধারণত ভূমিরূপের ভূ-সংস্থানগত পরিবর্তন আনে ও এরই প্রভাবে জোয়ারের উচ্চতা বেড়ে দ্বীপগুলি জলমগ্ন হয়ে মানুষের সম্পদহানি, গবাদি পশুর মৃত্যু ও শস্যহানির কারণ হয়ে ওঠে। অতীতে সুন্দরবনের কোনো কোনো দ্বীপে এমনই ভয়ঙ্কর ভূমিকম্পে সমগ্র দ্বীপভূমি জলে ডুবে মানবসভ্যতা লোপের উদাহরণ পাওয়া যায়।

(৬) বাঁধের ভাঙনের কারণ :

ওপরের আলোচনা থেকে এটাই বোঝা যাচ্ছে সুন্দরবনের জনজীবনের সুরক্ষা, শস্য ও সম্পদ রক্ষা সম্পূর্ণভাবে নির্ভর করছে দ্বীপগুলি ঘিরে ওই ৩৫০০ কিমি বেষ্টিত প্রান্তিক বাঁধগুলি উপযুক্ত রক্ষণাবেক্ষণের উপর। কিন্তু ওই বাঁধগুলির উপযুক্ত রক্ষণাবেক্ষণ এখনো পর্যন্ত পুরোপুরি সম্ভব হয়ে উঠেছে না বিভিন্ন কারণে। বাঁধের ভাঙনের কারণসমূহ নিম্নরূপ :

(ক) একরকম অগঠিত জমি পুনরুদ্ধারের পর দ্বীপগুলিতে বাঁধ দিয়ে ঘিরে দেওয়ার স্বাভাবিক কারণেই জোয়ারের জল দ্বীপগুলির ভেতর ঢুকতে পারে না। ফলে দ্বীপগুলির জমিরতল জোয়ারের উচ্চ জলতলের তুলনায় খুবই নীচু থেকে যায় এবং কোনো কারণে বাঁধ ভেঙে গেলে দ্বীপগুলির জমি গভীর জলে নিমগ্ন হয়। আরেকটি খারাপ প্রতিক্রিয়া হল নদী ও খাড়িগুলিতে ক্রমাগত পলি জমার ফলে তাদের তলদেশ ক্রমশ উঁচু হয়ে যায় ও জোয়ারের উচ্চতা বৃদ্ধির ফলে জলের চাপে বাঁধগুলি বিপন্ন হয়ে পড়ে।

(খ) সুন্দরবনের মাটির চরিত্র মোটেই মাটির বাঁধ নির্মাণের পক্ষে উপযুক্ত নয়। মাটি এখানে গঠিত হয়েছে বেশির ভাগই সূক্ষ্ম অবিন্যস্ত পলি দ্বারা। মাটি এখানে সহজেই ক্ষয়প্রাপ্ত হয় এবং জলের সংস্পর্শে এর প্রতিরোধ ক্ষমতা খুবই কম।

(গ) অতীতে সুন্দরবনের বাঁধগুলি কোনোরকম বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গি থেকে তৈরি হয়নি। বাঁধগুলি খুবই দুর্বল, তেমন প্রশস্ত নয় ও গঠন ত্রুটিপূর্ণ। বাঁধগুলি অবস্থানগতভাবে ত্রুটিপূর্ণ এবং উচ্চতা জোয়ারের উচ্চজলতলের তুলনায় বেশ কম। বাঁধগুলি তৈরি হয়েছে ঠিকই কিন্তু নদীতীরের ধনুকের মতো বক্র জায়গাগুলিতে বাঁধের সামনের চরজমি সেভাবে ছাড়া হয়নি, ফলে প্রায়ই ভাঙনের কবলে পড়ে ভেঙে যায়।

(ঘ) সুন্দরবনে জোয়ার-ভাটা একটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা গ্রহণ করে থাকে। বছরের ৩৬৫ দিনের প্রতিদিন প্রতি মুহূর্তে জলতল ওঠানামা করে, যা বাঁধের নিত্য ক্ষয়ক্ষতির কারণ। এছাড়া নদীগুলিতে জলপ্রবাহ ও জলের গতির পরিবর্তনের ফলে নদী ও খাড়িগুলির তলদেশ ও তীরভূমিতে ভূমিক্ষয় দেখা দেয়। যতক্ষণ না এই ভূমিক্ষয় বন্ধ করা যাচ্ছে ততক্ষণ বাঁধের ক্ষতি রোধ করা সম্ভব নয়।

(ঙ) সমুদ্রোপকূলে যখন ঘূর্ণিঝড় ওঠে তখন সুউচ্চ ঢেউ এসে বাঁধগুলির গায়ে আছড়ে পড়ে এবং বাঁধ ভেঙে বা টপকে জল ভেতরে ঢুকে যায়। সঙ্গে উচ্চ-জোয়ার থাকলে জলমগ্নতার পরিমাণ বেশি হয়। ফলে বন্যা দেখা দেয়।

(চ) নদী ও সমুদ্রোকূলবর্তী অঞ্চল থেকে অনবরত ম্যানগ্রাভ কেটে ফেলার কারণে মাটির বাঁধগুলি আরও ভয়ঙ্করভাবে এই ঘূর্ণিঝড়ের মুখোমুখি হয়ে পড়ে ও বাঁধগুলি ক্ষতিগ্রস্ত হয়।

(৭) বন্যা ও দুর্বিপাকের বিরুদ্ধে প্রতিরোধক উপায় :

পশ্চিমবঙ্গের সমুদ্রোপকূলের বাঁধগুলি ভাঙা বা ক্ষয় সংক্রান্ত ব্যর্থতা প্রতিরোধের উপায় প্রধানত, সময়ে উপযুক্ত ব্যবস্থা গ্রহণ করা ও রক্ষণাবেক্ষণের প্রতি বেশি করে যত্নবান হওয়া। এই যথোপযুক্ত ব্যবস্থাগুলি হল এরকম :

(ক) নতুন করে গড়ে ওঠা সমুদ্রোকূলবর্তী দ্বীপগুলিতে জমি পূর্ণ-উচ্চতা

প্রাপ্তির আগেই জমির পুনরুদ্ধার বন্ধ করতে হবে। সম্ভব হলে জলানুসন্ধান বিদ্যা অনুযায়ী জরিপের পর পলি জমে উঁচু হয়ে যাওয়া নদী ও খাড়িগুলি থেকে সময়ে বৈজ্ঞানিক প্রথায় মেশিনের সাহায্যে পলি সরাতে হবে।

(খ) বাঁধ নির্মাণের জন্য মাটি পরীক্ষার পর মাটি নির্বাচন করে রাখতে হবে এবং প্রয়োজনে সেই নির্বাচিত মাটি বেশ কিছুটা দূর থেকেও বাঁধ তৈরির জন্য সংগ্রহ করতে হবে।

(গ) অন্তত গত ৫০ বছরের তীব্র ঘূর্ণিঝড়ের কথা মাথায় রেখে জোয়ারের জলের সর্বাধিক উচ্চতা, ঢেউয়ের আঘাত ও অনুমিত ঝড়ের ব্যাপ্তির কথা ভেবে বাঁধ তৈরির আগে তার নকশা তৈরি করা উচিত।

(ঘ) সুন্দরবনের ভূমিক্ষয় দু' ভাবে হয়। প্রথমত ক্রমাগত ঢেউয়ের আঘাতে ও প্রবল ঝড়ের প্রকোপে নদীতীর, সমুদ্রোপকূল এবং বাঁধের ক্ষয় হয়। এই ভাঙন প্রতিরোধের উপায় হল নদীতীর অথবা বাঁধের ঢাল প্রয়োজনীয় নকশা অনুযায়ী উপযুক্ত মোটা ব্লক বা পাথর দিয়ে বাঁধানো। সমুদ্রসংলগ্ন নদীর বা খাড়ির বাঁধের ঢাল ৪ : ১ হারে হওয়া উচিত। প্রাকৃতিক ঝড়ঝঞ্ঝার আঘাত ও উচ্চতা অনুযায়ী সমুদ্র সংলগ্ন বাঁধের ঢাল ৬ : ১ থেকে ১০ : ১-এর মধ্যে থাকা দরকার। রক্ষণ আচ্ছাদনের নীচের প্রান্তভাগ জমির সমতলের বেশ কিছুটা নীচে রাখা উচিত এবং ওপরের প্রান্তে একটি গার্ডওয়াল দ্বারা উপযুক্তভাবে সুরক্ষিত করা দরকার। নদী ও সমুদ্র বাঁধগুলি রক্ষণাবেক্ষণের খরচ অনেক এবং উপকার প্রাপ্তির পরিপ্রেক্ষিতে যে খরচ তা লাভজনক হয় না। সে কারণেই আমাদের উচিত খুব সাবধানে ও ভেবে-চিন্তে বিচক্ষণতার সঙ্গে রক্ষণ কাজের জায়গা নির্বাচন করা, শুধু যে জায়গাগুলি নির্বাচন করা উচিৎ সেগুলি ঝড়ঝঞ্ঝায় খুবই স্পর্শকাতর ও সমস্যা উদ্রেগকারী। অন্যান্য জায়গায় অবশ্য প্রকৃতির সঙ্গে আপোস করে কিছুটা ঝুঁকি নেওয়া যেতে পারে।

বাঁধের দ্বিতীয় প্রকার ক্ষয় দেখা যায়, নদী ও খাড়ির প্রবাহমানতা ও স্রোতের পরিবর্তনের ফলে। এ ধরনের ভূমিক্ষয়ের হাত থেকে পরিত্রাণের জন্য কিছু গতানুগতিক সংরক্ষণের কাজ অবশ্য করা হয়, কিন্তু সাফল্যের হার তাতে তেমন উৎসাহব্যঞ্জক নয়। এছাড়া অন্যান্য অনেক অজানা জলপ্রবাহ সংক্রান্ত ও অন্যান্য বিষয় আছে যা এসব ভূমিক্ষয়ের পেছনে কাজ করে এবং এর সমাধানকল্পে স্বল্প আর্থিক সামর্থ্যের মধ্যে সম্পূর্ণভাবে ক্ষয়রোধকারী পন্থা এখনো উদ্ভাবন করা সম্ভব হয়নি। সম্প্রতি কোনো কোনো উন্নত দেশ অবশ্য প্রতিকারের উপায় বার করেছে যার খরচ অনেক বেশি, যা আমাদের মতো দেশে বোধহয় সে খরচ বহন করা সম্ভব নয়। একমাত্র বিকল্প পথ হল, নদী বাঁধ তৈরির সময় নদীর ধারে যথেষ্ট জায়গা ছেড়ে রেখে পেছনে আর একটি বাঁধ তৈরি করে রাখা। কিন্তু রিটায়ারড বাঁধ ও বরোপিট নির্মাণের জন্য সুন্দরবনে জমি পাওয়া খুবই শক্ত। কেননা ১৮৯৪ সালের অ্যাক্ট ১ অনুসারে সুন্দরবনে জমি অধিগ্রহণ করা খুবই এক দীর্ঘমেয়াদী ব্যাপার। আর একটি উপায় অবশ্য আছে যা, কাজে খুবই সক্ষম ও আর্থিকভাবেও লাভজনক, তা হল তীরভূমি সংলগ্ন চরজমিতে নদীতীর ও বাঁধের মাঝখানে কমপক্ষে ১০০ মিটার চওড়া জায়গা ছেড়ে রেখে উপযুক্ত বৃক্ষ রোপন

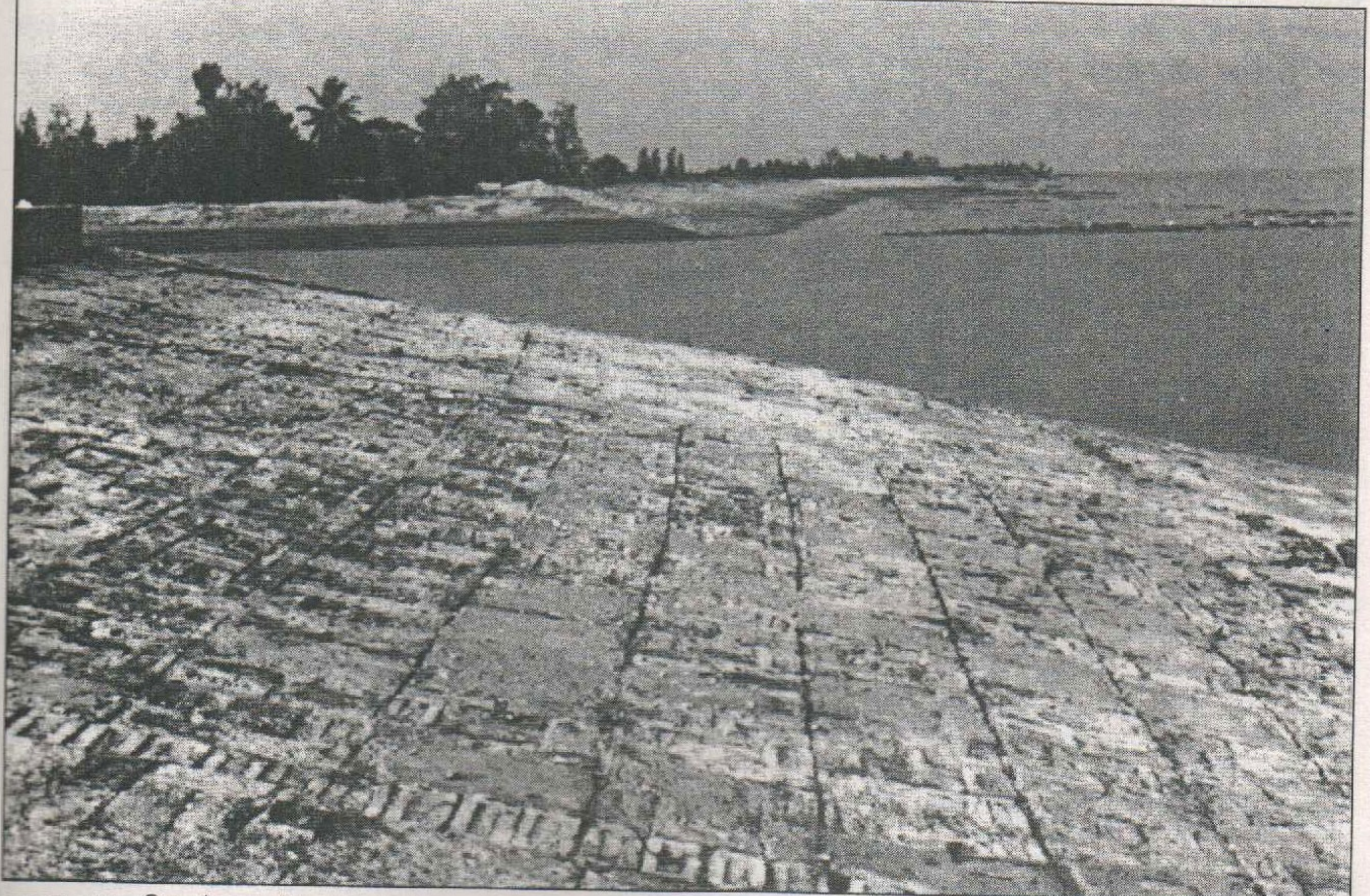

ব্লক বা পাথর দিয়ে বাঁধানো বাঁধেরও ক্ষয় হয়।

করা। আঁকাবাঁকা জায়গায় নদী যেখানে ধনুকের মতো বাঁক নিয়েছে সেখানে বাঁধ নির্মাণ যতদূর সম্ভব পরিহার করা উচিত, কেননা এ সমস্ত জায়গাগুলি অত্যন্ত ভাঙনপ্রবণ। এখানে বাঁধ নির্মাণ করতে গেলে নদীর ধার থেকে অন্তত ২০০ মিটার দূরত্বে নির্মাণ করা দরকার।

(ঙ) আর একটি সমস্যা পরিকল্পনাবিদদের দৃষ্টি আকর্ষণ করবে, যা হল দ্বীপগুলির অভ্যন্তরের নিকাশি ব্যবস্থা। বর্ষাকালে ভরা বর্ষার একটানা বৃষ্টিতে দ্বীপগুলি সহজেই জলমগ্ন হয়ে বন্যার কারণ ঘটায়। এর একমাত্র সমাধান হল, প্রয়োজন মতো একাধিক কপাটযুক্ত প্রয়োজনীয় স্লুইসগেট তৈরি করা, যে গেটগুলি দ্বীপগুলির ভেতরের জমা জল খাড়ি ও বড় নদীর মাধ্যমে বের করে দেবে। আশার কথা যে, সুন্দরবনের বাঁধগুলির দায়-দায়িত্ব নেবার পর থেকে পশ্চিমবঙ্গ সরকারের সেচ ও জলপথ দপ্তর ও সুন্দরবন উন্নয়ন পর্ষদের যৌথ উদ্যোগে প্রয়োজন অনুসারে বিভিন্ন মাপের প্রায় ৯৮০টি স্লুইসগেটে ইতিমধ্যেই তৈরি হয়েছে সুন্দরবনে। বর্তমানে এসব অঞ্চলের নিকাশি ব্যবস্থার অনেকটাই সমাধান করা গেছে।

(চ) তবে ভূমিকম্প ও ভয়ঙ্কর ঘূর্ণিঝড়ের মতো প্রাকৃতিক দুর্যোগের কবল থেকে সুন্দরবনকে মুক্ত করতে স্বয়ংসম্পূর্ণ কোন ব্যবস্থা এখনো করে ওঠা যায়নি। এক্ষেত্রে প্রধান কাজ হল এখানে উন্নয়নের কাজে নিযুক্ত রাজ্য সরকারের বিভিন্ন বিভাগের মধ্যে একটা সমন্বয় সাধন করে চলা, যাতে আবহাওয়া ও ঘূর্ণিঝড় সম্পর্কে তারা আগেই মানুষকে সজাগ করতে পারে এবং জনসাধারণও আগেই সতর্ক হয়ে তাদের জীবন ও সম্পদ রক্ষা করতে সমর্থ হয়। প্রয়োজনে স্থানীয় প্রশাসন এলাকার মানুষকে যথাসময়ে নিরাপদ স্থানে পৌঁছে দিয়ে ক্ষয়ক্ষতির হাত থেকে তাদের রক্ষা করতে পারে। এই বিপদসঙ্কুল সময়ে স্থানীয় পঞ্চায়েত ও বেসরকারি সংস্থাগুলিও উদ্ধারের কাছে মুখ্যভূমিকা গ্রহণ করতে পারে।

ভূমিকম্পের সময়ে প্রকৃতপক্ষে তাৎক্ষণিক কিছু বুদ্ধি প্রয়োগ করে বাঁচা ছাড়া মানুষের তাকে নিয়ন্ত্রণের কোনো ক্ষমতাই

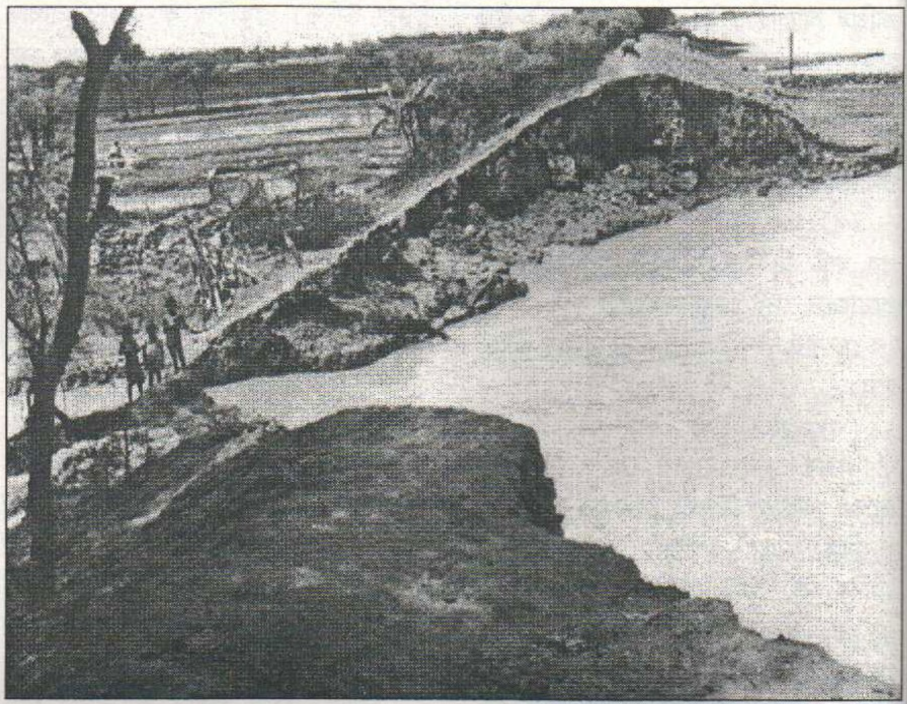

প্রবল ঢেউয়ের চাপে উড়ে যাওয়া বাঁধ।

থাকে না। মোটের ওপর, এই অঞ্চলে প্রাকৃতিক দুর্যোগের সময় সংরক্ষিত এলাকার বনসম্পদ ও বন্যপ্রাণীদের ধ্বংসের হাত থেকে রক্ষা করার ক্ষেত্রে বর্তমানেও মানুষের কিছু করা সম্ভব হয়নি।

পরিশেষে একটাই কথা, সুন্দরবনকে বাঁচাতে গেলে সর্ব প্রথমেই যা করা দরকার তা হল, যথেচ্ছভাবে এ অঞ্চলের বনাঞ্চল কাটা বন্ধ করতে হবে এবং এখানকার আবহাওয়া ও প্রকৃতির সঙ্গে সহাবস্থানের মাধ্যমে আরও নতুন নতুন উপযোগী বৃক্ষ রোপন করতে হবে, তবেই সুন্দরবন তার অস্তিত্ব রক্ষা করতে পারবে।

জ্যোতির্ময় সরকার ☐ *মুখ্য বাস্তুকার, সেচ ও জলপথ দপ্তর*

পশ্চিমবঙ্গের দক্ষিণ-পূর্বে বঙ্গোপসাগরের উপকূলবর্তী ১০২টি দ্বীপের সমন্বয়ে সুন্দরবন। উত্তর চব্বিশ পরগনার হিঙ্গলগঞ্জ, সন্দেশখালি-১, সন্দেশখালি-২, হাড়োয়া, মীনা খাঁ, হাসনাবাদ এবং দক্ষিণ চব্বিশ পরগনার কাকদ্বীপ, ক্যানিং-১, ক্যানিং-২, নামখানা, সাগর, বাসন্তী, পাথরপ্রতিমা, গোসাবা, মথুরাপুর-১, মথুরাপুর-২, জয়নগর-১, জয়নগর-২ ও কুলতলি—এই মোট ১৯টি ব্লকের ৭,৯০০ বর্গকিমি জুড়ে এর অবস্থান। এখানেই পৃথিবীর সর্ববৃহৎ ব-দ্বীপ। ১০২টি দ্বীপের মাত্র ৫৪টি দ্বীপে জনবসতি আছে।

সুন্দরবনে সেচ ও জলপথ বিভাগের কাজ

মোট প্রান্তীয় নদীবাঁধ ☐ ৩৫০০ কিলোমিটার

উত্তর চব্বিশ পরগনা : ৭৫০ কিমি

দক্ষিণ চব্বিশ পরগনা : প্রায় ২৭৫০ কিমি

মোট স্লুইস গেটের সংখ্যা ☐ ৮২৫

উত্তর চব্বিশ পরগনা : ১৭২

দক্ষিণ চব্বিশ পরগনা : ৬৫৩

শহর কলকাতা ও তার আশেপাশের নিকাশি ব্যবস্থা : অতীত ও বর্তমান

অঞ্জন দাশগুপ্ত

১। ভূমিকা

শহর কলকাতা, লেখক দমিনিক লেপিয়েরের ভাষায় 'City of Joy' হুগলির পূর্বদিকে সমুদ্র মোহনার ১৩০ কিমি উজানে অবস্থিত। দিল্লি, বারানসি বা উজ্জয়িনীর মতো অবশ্য কলকাতার ঐতিহাসিক গরিমা নেই। তবে অতীতের অনেক শহরকে পেছনে ফেলে এই শহর আজ আয়তনে ও গুরুত্বে ভারতের অন্যতম বৃহত্তম শহরের মর্যাদা পেয়েছে। সুতানুটি, গোবিন্দপুর ও কলিকাতা—এই তিনটি অখ্যাত গ্রামকে কেন্দ্র করে আদি কলকাতার সূচনা। পরবর্তীকালে বসতি বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে শহরটি চারদিকে সম্প্রসারিত হয়েছে। ইতিহাসের পাতা ওলটালে ১৪৯৫ সালে বিপ্রদাসের 'মনসা মঙ্গল' কাব্যে, ১৫৮০ সালে কবিকঙ্কণ মুকুন্দরামের 'চণ্ডীমঙ্গল' কাব্যে বা ১৫৮৫ সালে আবুল ফজলের 'আইন-ই-আকবরী'তে অখ্যাত কলকাতা গ্রামটির উল্লেখ পাওয়া যায়। স্যাঁতস্যাঁতে জমি, শ্বাপদসংকুল অরণ্য, জলবেষ্টিত অঞ্চল এবং দূষিত বা অস্বাস্থ্যকর আবহাওয়াই ছিল তখন এই গ্রামের পরিচিতি। ইংরেজদের গোড়া পত্তনের সঙ্গে সঙ্গে এই শহর বাড়তে শুরু করে। অনেকটা পরিকল্পনাহীন ও এলোমেলোভাবে। বিখ্যাত ইংরেজ সাহিত্যিক রুডিয়ার্ড কিপলিং এই শহরের পত্তন এবং ক্রমোন্নতির কথা বলতে গিয়ে লিখেছিলেন :

> "Chance erected, chance directed, Laid and built on the silt
> Palace, byre, hovel–Poverty and Pride
> side by side.''

ইংরেজরা অবশ্য এখানে বিনা কারণে বসতি গড়েনি। সরস্বতী নদীর বুকে বিপুল পরিমাণে পলি জমে যাওয়ায় এককালের সুবিখ্যাত সপ্তগ্রাম বন্দর ব্যবহারের অযোগ্য হয়ে ওঠে। হুগলি ও সপ্তগ্রামে বসবাসকারি বণিক সম্প্রদায় শেঠ, মল্লিক এবং বসাক তাঁতিদের কাছে শুনে হুগলি নদীর ভাঁটির দিকে তারা কলকাতায় আস্তানা গাড়ে। আজকে সেই মূল কলকাতা শহর বা পৌর এলাকার মোট আয়তন প্রায় ১০০ বর্গ কিমি। ১৯৮৪ সালে তিনটি ভূতপূর্ব পৌর এলাকা সংযোজিত হয়ে পুর এলাকার আয়তন গিয়ে দাঁড়ায় ১৮৭.৩৩ বর্গ কিমি। ২০০১ সালের আদমশুমারি অনুযায়ী এর জনসংখ্যা দাঁড়ায় ৪৫,৮০,৫৪৪ যার মধ্যে রয়েছে ১৫টি পৌর এলাকা (borough) এবং ১৪১টি তৌজি (ward)।

টালিগঞ্জ-পঞ্চাননগ্রাম খাল

২। গোড়ার কথা

একটি সুচিন্তিত পরিকল্পনা ব্যতিরেকেই শহরটি এলোমেলোভাবে বাড়তে থাকে। শহরের গোড়া পত্তনের প্রথমদিকে নিকাশি ব্যবস্থাকে বিশেষভাবে গুরুত্বই দেওয়া হয়নি, যা নগরায়নের একটি প্রধান অঙ্গ। প্রাকৃতিক নিয়মেই নদীর তীরবর্তী অঞ্চল অপেক্ষাকৃত উঁচু (Level) এবং জমির অবনমন বা ঢাল নদী তটবর্তী স্থান থেকে পূর্বমুখী। প্রথমদিকে স্বাভাবিক ঢালের বিপরীতমুখী অর্থাৎ পশ্চিমদিকে একটি খাঁড়ির মাধ্যমে প্রিন্সেপ ঘাটের কাছে হুগলি নদীর জলনিকাশ করা হত। অধুনালুপ্ত এই খালটির উৎপত্তিস্থান ছিল বর্তমানে লবণহ্রদ অঞ্চল, মধ্যবর্তী স্থানগুলো ছিল ঘন বসতিপূর্ণ বেলেঘাটা, শিয়ালদা, ক্রীক রো, ধর্মতলা, গভর্ণমেন্ট প্লেস (উত্তর) এবং হেস্টিংস। ১৭৩৭ সালে কলকাতার আশপাশ অঞ্চলে একটি প্রচণ্ড ঘূর্ণিঝড়ের প্রভাবে এই খাঁড়িটি নৌ পরিবহনের ক্ষেত্রে প্রায় অযোগ্য হয়ে পড়ে এবং নিকাশি ব্যবস্থার গুরুত্ব অনেকটাই হারিয়ে ফেলে। এর পরে শহরটিকে ঘিরে মারহাট্টা ডিচ (বর্তমানের সার্কুলার রোড) খননের সঙ্গে সঙ্গে ১৭৪২ সাল থেকে এর মৃত্যুঘণ্টা বেজে যায়।

লর্ড ওয়েলেসলির আমলে গঠিত উন্নতি কমিটি (Improvement Committee) বিভিন্ন ব্যাপারে নজর দেওয়ার সঙ্গে সঙ্গে নিকাশি, পয়ঃপ্রণালীর উন্নতি সাধন এবং আবর্জনা নিস্কাশনের উপর গুরুত্ব দেওয়া শুরু করে। কলকাতা শহরের নিকাশি ব্যবস্থার প্রথম পদক্ষেপ হিসেবে বেলেঘাটা খাল খনন করা হয়। তবে এর সঙ্গে কতগুলি নালা খননের ফলে স্বাভাবিক নিকাশি অবরুদ্ধ হওয়ায়

অবস্থার অবনতি হয়। এই সময়ে বিদ্যাধরীর অন্যতম শাখাপ্রবাহ ১৮৩০ সালে ও বর্তমানের ক্রীক রো পর্যন্ত ধাপার কাছে প্রসারিত ছিল এবং ধাপার কাছে এর গভীরতা ছিল ৬.১০ মি (২০ ফুট)। নিকাশি ব্যবস্থার কাজে তখন এটি ছিল যথাযথ। কিন্তু ১৮২৯ সালে এন্টালী থেকে হুগলি নদী পর্যন্ত প্রসারিত সার্কুলার খাল খননের কারণে এই পুরান প্রবাহটি প্রায় অকেজো হয়ে পড়ে।

৩। পরবর্তী পদক্ষেপ-ক্লারকের নিকাশি প্রকল্প

জনসংখ্যা বৃদ্ধি এবং শহর সম্প্রসারণের কারণে নিকাশি ব্যবস্থার ক্রমাবনতি ঘটতে থাকে। ভাবনাচিন্তা শুরু হতে থাকে বিভিন্ন মহলে। উনিশ শতকের শেষের দিকে নিকাশি ব্যবস্থা এবং তার সঙ্গে সঙ্গে স্বাস্থ্যোন্নতির দিকে বিশেষ গুরুত্ব দেওয়া হল। ফলশ্রুতি হিসেবে তদানীন্তন কলকাতা পৌর নিগমের মুখ্য বাস্তুকার উইলিয়াম ক্লার্ক এক প্রকল্প রচনা করেন। বন্যার জল এবং প্রতিদিনের নোংরা জল (Storm water, dry weather flow) নিষ্কাশন একত্রে করার জন্য এই পরিকল্পনা রচনা করা হয়েছিল। ১৮৫৫ সালে উপস্থাপন করে ১৮৬০ সাল থেকে ১৮৭৫ সালের মধ্যে এটি রূপায়িত হয়। ৩৪ লক্ষ টাকার এই প্রকল্পটি সরকারি অনুমোদন পায় ১৮৫৯ সালে। ৪৬০০ একর (৭.১৪ বর্গ মাইল বা ১৮.৫০ বর্গ কিমি) অঞ্চলের জল নিকাশিত হত পামার ব্রিজের কাছে। ২৪ ঘণ্টায় সর্বোচ্চ পরিমাণ ৬ ইঞ্চি (১৫২ মিমি) বা প্রতি ঘণ্টায় ¼ ইঞ্চি বা ৬.৩৩ মিমি বৃষ্টিপাত ধরে এই পয়ঃপ্রণালীর (sewer) আকার নিরুপণ করা হয়েছিল। এই পয়ঃপরণালী ব্যবস্থা বা 'clarke's sewarage scheme' নামে পরিচিত প্রকল্পের অধীনে নিকাশি ড্রেন সবই ছিল ভূগর্ভস্থ এবং শহরের সড়কের তলায় এবং অন্যান্য ছোটো বড় ড্রেনের সঙ্গে পরস্পর ভাবে যুক্ত হয়ে একটি জালের আকারে ছিল বেষ্টিত। এই ভূগর্ভস্থ পয়ঃপ্রণালী আকারে ২.৪৪ মি উঁচু (৮ ফুট) ১.৮৩ মি (৬ ফুট)। এর পরে ১৮৯৬ সালে এই প্রকল্পটি কিছুটা পরিবর্তিত এবং পরিবর্ধিত হয় এবং নিকাশি এলাকা বেড়ে দাঁড়ায় ৭.৫০ বর্গ মাইল (১৯.২ বর্গ কিমি)। Clarke-এর এই প্রকল্প সীমাবদ্ধ ছিল শহরের মধ্য অঞ্চলের নিকাশি ব্যবস্থার মধ্যে এবং এই ব্যবস্থার মধ্যে অন্যতম ছিল পামার ব্রিজে একটি পাম্পিং স্টেশন স্থাপন। এর পরে এই পাম্পিং স্টেশনের মাধ্যমে তিন মাইল (৪.৮৩ কিমি) দূরে বিদ্যাধরীর একটি শাখানালা রাজখালের ও লবণ হ্রদের মাধ্যমে এই জল নিষ্কাশনের ব্যবস্থা করা হয়। ক্লার্কের এই মহতী পরিকল্পনার বেশির ভাগটাই ১৩০-১৪০ বছরের পরেও দাঁড়িয়ে আছে বিশেষ করে ভূগর্ভস্থ পয়ঃপ্রণালী ব্যবস্থা। তবে বিদ্যাধরী নদী মজে যাওয়ায় নির্গমন পথ পরিবর্তিত হয়। এ ব্যাপারে পরে আসছি।

গুরুত্ব বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে শহর ক্রমশ বিস্তৃতি লাভ করতে আরম্ভ করে। পশ্চিমে হুগলি নদী, পূর্বে লবণ হ্রদ, শহরের বাড়ার জায়গা কেবল তাই দক্ষিণ দিক।

এই সবদিক ভেবে শহরতলি নিকাশি প্রকল্প বা suburban sewarage scheme রূপায়িত হয় ১৮৯১ থেকে ১৯০৬ সালের মধ্যে। এর আওতায় ছিল ১২.৫ বর্গ মাইল (৩২ বর্গ কিমি) অঞ্চল এবং বালিগঞ্জে নির্মিত হয় একটি পাম্পিং স্টেশন এবং পামার ব্রিজটির ক্ষমতা বৃদ্ধি করা হয়। এখানেও এই পয়ঃপ্রণালী ব্যবস্থাটি ছিল সম্পূর্ণ ভূগর্স্থ এবং তফসিয়ায় উঁচু স্তরের পয়ঃপ্রণালীতে (high level sewer) এই পাম্পিং ব্যবস্থার মাধ্যমে জল নিষ্কাশন করা হয়। এর পরে জল প্রবাহিত হয়ে যায় বিদ্যাধরীর সেই শাখা খাল রাজাখালের মাধ্যমে।

এর পরে জনসংখ্যাবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে মাণিকতলা, কাশীপুর, চিৎপুর, গার্ডেনরিচ অঞ্চলকেও শহরের নিকাশি ব্যবস্থার অন্তর্গত করা হয়। নিকাশি নালা হিসেবে বিদ্যাধরী তার যথার্থ ভূমিকা পালন করে যায়। কিন্তু এর অপমৃত্যু সবারই ধারণার বাইরে ছিল। ১৯২৮ সাল থেকে বিদ্যাধরী ক্রমাগত মজতে শুরু করে, বুকে সঞ্চিত হতে থাকে পলির স্তর। অপরিসর হতে হতে বহন ক্ষমতা একেবারেই কমে যায়। এর কয়েকটি প্রধান কারণ—(১) উজান থেকে জলপ্রবাহ কমে যাওয়া, (২) স্থানীয় মৎস্যচাষ বৃদ্ধি এবং (৩) লবণহ্রদের কিয়দংশকে চাষের জমিতে রূপান্তরিত করা। এ ছাড়াও অন্যতম কারণগুলো হল ১৮৮১ সালে ধাপা লক নির্মাণ, ১৮৯৭ সালে ভাঙর খাল এবং ১৯১০ সালে কেষ্টপুর খাল খনন। বিভিন্ন বছরে বিদ্যাধরীর অবস্থা এবং ক্রমাগত অবক্ষয়ের চিত্র নিচের সারণি-১তে তুলে ধরা হল :

সারণি-১

ক্রমিক নং	বছর	ঘটনা	বামনঘাটায়	
			বিদ্যাধরীর	পরিসরতা
১	১৮২৯	সার্কুলার খাল খনন	বর্গ ফুট	(বর্গ মি)
২	১৮৩০	কুলটি গাং এবং বিদ্যাধরীর সংযুক্তিকরণ	১৯২০	(১৭৮.৩৮)
৩	১৮৫৯*	নিউকাট খাল খনন		
৪	১৮৮১-৯৭	ব্যাপকভাবে খাল খনন		
৫	১৮৮৩		১৩,৬৭৪	(১২৭০.৩৯)
৬	১৯০৪		৯,৭০০	(৯০১.১৯)
৭	১৯১০	কেষ্টপুর খাল খনন		
৮	১৯১৩		৬৪৯০	(৬০২.৯৬)
৯	১৯২৮		১০০০	(৯২.৯১)

উপরের সারণি থেকে দেখা যাবে যে ১৮৮৩ সালে বিদ্যাধরী সবচেয়ে প্রাণোচ্ছল ছিল যখন এর পরিসর ছিল ১৩,৬৭৪ বর্গফুট। কিন্তু উজানের যমুনা নদীর প্রবাহ কমে যায় এবং অবক্ষয় শুরু হয়। বাঁচিয়ে রাখার অনেক প্রয়াস নেওয়া হয়। কিন্তু সর্ব প্রচেষ্টাই ব্যর্থ হয়। এককালের স্রোতঃসলিলা বিদ্যাধরীর উপরে নেমে আসে বিপুল বিপর্যয়, ফলে অপমৃত্যু ঘটে। পরিণত হয় এক অপরিসর নালায়। ১৯২৮ সালের জুলাই মাসে নিকাশি নালা হিসেবে এটি পরিত্যক্ত হয়।

৫। বি এন দের জল নিষ্কাশন পরিকল্পনা

বিদ্যাধরী নদীর অবক্ষয়ের কারণে শহরের নিকাশি ব্যবস্থায় নেমে আসে এক বিপর্যয় ঘোর অনিশ্চয়তা। তাই অবিলম্বে একটি বিকল্প নিষ্কাশন পথ উদ্ভাবন অপরিহার্য হয়ে উঠল। নাম উঠে এল হুগলি, পিয়ালি এবং কুলটি গঙের। হুগলি নদীতে জল নিষ্কাশন স্বাস্থ্যের কারণে একদিকে যেমন বাধাপ্রাপ্ত হল অন্যদিকে পবিত্র নদীতে নোংরা জল ফেলার পরিকল্পনায় অনেক মহলে অসন্তোষ দেখা দিল এবং কোনোভাবেই মেনে নেওয়া গেল না। অন্যদিকে মাতলা-বিদ্যাধরীর অন্তর্গত নদী হওয়ায় পিয়ালিও গ্রহণযোগ্য হল না। বিভিন্ন বাস্তুকারগণ কুলটি গাংকেই বেছে নেওয়ার ব্যাপারে মত প্রকাশ করলেন। কলকাতা পৌর নিগমের তদানীন্তন বিশেষ আধিকারিক পদে তখন অধিষ্ঠিত ছিলেন ড. বি. এন. দে। ১৯২৯ সালে তিনি তাঁর বিখ্যাত 'কুলটি নিষ্কাশন প্রকল্প' (kulti outfall scheme) রচনা করেন। এর আনুমানিক মূল্য ধরা হয় ৬৫ লক্ষ টাকা। অনেক পর্যালোচনার পরে ১৯৩৫ সালে কিছু রদবদল করে সরকার এটি গ্রহণ করে এবং কাজ শুরু করা হয়।

Kulti outfall Scheme-এর প্রধান অঙ্গগুলো হল :

(১) তপসিয়া লক থেকে ঘুষিঘাটার কাছে একটি জলকপাট (Sluice) এর মাধ্যমে কুলটিগাঙে নির্গত ৩৪ কিমি দৈর্ঘ্য বিশিষ্ট বাঁধানো নোংরাজল পরিবাহিত নিকাশি নালা (Dry weather Flow) বা D.W.F. channel।

(২) পামার বাজার থেকে ৭.৪৭ কিমি দৈর্ঘ্য বিশিষ্ট বর্ষার জল বের করে দেওয়ার Town Head cut (THC) নিকাশি খাল (Storm weather Flow channel বা SWF channel)। এই নিকাশি খালটি উপরোক্ত DWF এর সঙ্গে বানতলায় মিলিত হয়। বানতলায় নোংরা জলের প্রাথমিক বিশুদ্ধকরণের জন্য দুটি পলি নিষ্কাশক জলাধার (sedimentation tank) নির্মাণ।

(৩) বালিগঞ্জ পাম্পিং স্টেশন থেকে ৭.১৬৩ কিমি দৈর্ঘ্যবিশিষ্ট বর্ষার জল বের করে দেওয়ার আর একটি নিকাশি খাল যেটি suburban Head cut বা S.H.C. নামে পরিচিত। উপরোক্ত THC'-এর সঙ্গে বানতলায় মিলিত হবার পর এই সম্মিলিত প্রবাহিত খালের নাম Storm Weather Flow Channel (S.W.F.C)।

(৪) ধাপা লক পাম্পিং স্টেশন থেকে নির্গত ১.৮২৯ কিমি দৈর্ঘ্য বিশিষ্ট আর একটি তৃতীয় Storm Water Flow Channel যেটি THC'-এর সঙ্গে মাকালপোতায় গিয়ে মিশেছে।

SWF Channel-টি তলায় ১২০ ফুট চওড়া, (৩৬.৫৮ মি) বহন ক্ষমতা ৭৬.৪৭ কিউমেক (২৭০০ কিউসেক), অন্যদিকে DWF-টি কংক্রিটের বাঁধানো এবং বহন ক্ষমতা ১৮.৯৭ কিউমেক (৬৭০ কিউসেক)। SHC-র মোট দৈর্ঘ্য ৩৪ কিমি এবং ঘুষিঘাটায় একটি ২০ সংখ্যক এবং অন্যটি ১৬ সংখ্যক gate বিশিষ্ট regulator এর মাধ্যমে জল নির্গমনের ব্যবস্থা রয়েছে।

মৎস্যচাষের জন্য জল সরবরাহ

DWF খালটি SWF খালের মোটামুটি সমান্তরালভাবে চালিত এবং গৃহস্থালির নোংরা জল, শিল্পসমূহ থেকে নির্গত নোংরা জল এবং অন্যান্য বর্জ্যপদার্থ বহন করে। মৎস্যচাষের জন্য এই জলের চাহিদা প্রচুর। এছাড়া ভৌগোলিক পরিবেশ অনুকূল থাকায় এই সব অঞ্চলে বিশেষ করে উত্তর বিধাননগর, ভাঙড়, সোনারপুর এবং তিলজলা থানার অধীন বিভিন্ন স্থানে গড়ে উঠেছে প্রচুর মাছের ভেড়ি। বানতলায় ৯টি ফোকর (Vent) বিশিষ্ট রেগুলেটার থেকে একটি নালার মাধ্যমে উজানের দিকে এই জল সরবরাহ করা হয়। মৎস্যচাষের জন্য এই ভেড়িগুলিতে তাই থিতিয়ে পড়া এবং অন্যান্য প্রাকৃতিক রাসায়নিক প্রক্রিয়ায় এই জল অনেকটাই পরিশুদ্ধ হয়ে যায়। এ ছাড়া ধাপা লক পাম্পিং স্টেশন থেকেও প্রয়োজনের সময় D.W.F. খালের মাধ্যমে ৬০-১০০ কিউসেক জল সরবরাহ করা হয়।

বানতলা Regulator Gate-এ ২.৪৪ মি (৮ ফুট) থেকে জলতল নেমে গেলে মাছের ভেড়িসমূহে জল সরবরাহে বিঘ্ন হয়। আবার এই জলতল রাখতে হলে সমস্যা দেখা দেয় বিশেষ করে বর্ষাকালে। কারণ এর ফলে তপসিয়া ও পামার বাজারে জলতল উঠে যায় যথাক্রমে ৯.৫ ফুট এবং ১১ ফুট এবং পাম্পিং ব্যবস্থায় জটিলতা দেখা দেয়। জমাজল নেমে যেতে অনেক সময় লেগে যায়। আবার বানতলা Gate বন্ধ থাকলে প্রচুর পরিমাণে পলি জমে যায় THC'র বুকে এবং এর অপসারণ বেশ ব্যয়বহুল।

৬। কলকাতা শহরের বর্ষার চিত্র

কলকাতা শহর ভারতবর্ষের আবহ দপ্তরের অন্তর্গত গাঙ্গেয় পশ্চিমবঙ্গের মধ্যে পড়ে। বাৎসরিক গড় বৃষ্টিপাতের পরিমাণ আলিপুরে ১৬১০ মিমি এবং দমদমে ১৫১০ মিমি। কখনও কখনও দৈনিক বৃষ্টিপাতের পরিমাণ ৩০০ মিমিও ছাপিয়ে যায়। বিভিন্ন সময়ের এই অতি বৃষ্টিপাতের পরিমাণের চিত্র নীচের সারণি-২তে তুলে ধরা হল :

সারণি-২

তারিখ	বৃষ্টিপাতের পরিমাণ (মি মি)	সময় কাল
৩০.৯.১৭৩৮	৩৮১	৫ ঘণ্টা
১৪.৮.১৭৮৮	২৫৩	২০ ঘণ্টা
২০.৬.১৮৯৩	২১৩	৩৬ ঘণ্টা
১৯.৯.১৯০০	৩৬৯	২৪ ঘণ্টা
২০.৯.১৯০০	২৭৫	২৪ ঘণ্টা
১৩.৫.১৯১৩	২৫	১০ মিনিট
২৬.৯.১৯৭৮	৭৩৫.৩০	
১.১০.১৯৭৮	(২৮.৯৯.৭৮. এ সর্বোচ্চ ৩৬০.৬০)	২৪ ঘণ্টা
৩.৬.১৯৮৪ ৪.৬.১৯৮৪	৪৯৯.২৫	
২৩.৯.১৯৯৯ ২৫.৯.১৯৯৯	৩৩৪.১০	১০ ঘণ্টা

৭। শহরের নিকাশি আঞ্চলিক বিভাগ

শহর কলকাতাকে নিম্নোক্ত ছটি প্রধান নিকাশি অঞ্চলে ভাগ করা যায় :

(১) উত্তরাঞ্চল বা কাশিপুর এলাকা
(২) মধ্যাঞ্চল বা শহর এলাকা
(৩) দক্ষিণ-মধ্যাঞ্চল বা শহরতলি এলাকা
(৪) দক্ষিণাঞ্চল বা টালিগঞ্জ, যাদবপুর এলাকা
(৫) পূর্বাঞ্চল বা মানিকতলা এলাকা
(৬) দক্ষিণ শহরতলি অঞ্চল বা বেহালা, গার্ডেনরীচ এলাকা

বিভিন্ন এলাকা ভিত্তিক নিকাশি ব্যবস্থার চিত্র নীচের সারণি-৩তে তুলে ধরা হল :

সারণি-৩

ক্রম	অঞ্চল	আয়তন (বর্গ কি.মি.)	তৌজি (Ward)	নিকাশি মাধ্যম
১।	মূল শহর	১০৪	১-১০০	S.W.F. বেলেঘাটা খাল, বাগডেজোলা খাল
২।	যাদবপুর	৪০	১০১-১১৪	টালিগঞ্জ-পঞ্চান্নগ্রাম এটি চৌভাগা পাম্পিং স্টেশনের মাধ্যমে SWF-এ জল নিষ্কাশন করে টালিনালা
৩।	দক্ষিণ শহরতলি	৩০.৩৮	১১৫-১৩২	চড়িয়াল, মণিখালি খাল যেগুলো হুগলি নদীতে জল নিষ্কাশন করে
৪।	গার্ডেনরীচ	১২.৯৫	১৩৩-১৪১	
		১৮৭.৩৩	১৪১	

এবারে এই অঞ্চলগুলোর সীমানা নিয়ে একটু আলোচনা করা যাক। ওপরোক্ত বা কাশিপুর এলাকার জল নিকাশি মাধ্যম অংশত বাগজোলা খাল এবং অংশত হুগলি নদী। বাগজোলা খালের উৎপত্তি বি টি রোড সংলগ্ন ডানলপ ব্রিজের নিকটে এবং ঘুষিঘাটায় একটি স্লুইসের মাধ্যমে কুলটিগাঙে গিয়ে পড়ে। এর বিভিন্ন শাখাগুলি হল উদয়পুর খাল, সোনাই খাল, ক্যান্টনমেন্ট খাল। প্রচণ্ড ঘনবসতিপূর্ণ জায়গা নোয়াপাড়া অক্ষয় মুখার্জি রোড, বেদিয়াপাড়া, যশোর রোড, দমদম রোড, ভি আই পি রোড অঞ্চলের মধ্য দিয়ে খালটি প্রবাহিত। মোট ১৬৪ বর্গ কি. মি অঞ্চলের জল নিকাশি বাগজোলা ও তার শাখা খাল সমূহের আওতায়। বাগজোলা খালের মোট দৈর্ঘ্য ৩৮.০৪৮ কিমি। এর মধ্যে শুরু থেকে ভি আই পি রোড সংযোগস্থল পর্যন্ত অংশকে বলা হয় উচ্চ বাগজোলা খাল বা Upper Bagjola Khal। এর দৈর্ঘ্য ৯.২৩ কিমি এবং নিকাশি এলাকার পরিমাণ ৪৯.২০ বর্গ কিমি। অন্যদিকে ভি আই পি সংযোগস্থল থেকে নির্গত স্থান পর্যন্ত অংশকে বলা হয় নিম্ন বাগজোলা খাল বা Lower Bagjola Khal যার দৈর্ঘ্য ২৮.৮১৮ কিমি এবং নিকাশি এলাকা ১১৪.৮০ বর্গ কিমি। যেখানে সবচেয়ে উত্তরদিকের জল সরাসরি বাগজোলায় গিয়ে পড়ে সেখানে মধ্যবর্তী এবং দক্ষিণবর্তী অঞ্চলের জল বীরপাড়া এব দত্তবাগান পাম্পিং স্টেশনের মাধ্যমে খালটিতে গিয়ে পড়ে। অন্যদিকে বাদবাকি অঞ্চল অর্থাৎ বি টি রোডের পশ্চিম অঞ্চলের জল হুগলি নদীর মাধ্যমে নিষ্কাশিত হয়। অন্যদিকে নিম্ন বাগজোলা খাল কেষ্টপুর ভাঙরকাটা খালের সঙ্গে তিনটি স্থানে যুক্ত। এর মধ্যে প্রথমটি কেষ্টপুর অঞ্চলে মিশন বাজারের কাছে একটি Link regulator-এর মাধ্যমে দ্বিতীয়টি রাজারহাটে জোয়ালভাঙা খালের মাধ্যমে এবং তৃতীয়টি ভাঙর অঞ্চলে চৌরেশ্বর খালের মাধ্যমে। নিম্ন বাগজোলা খালের বিভিন্ন শাখা খালগুলির নাম BB_1, CC_1, DD_1, EE_1, EE_2, XX_1

মধ্যাঞ্চল বা শহর এলাকার আওতাধীন স্থান হল উত্তরে গ্যালিফ স্ট্রিট থেকে দক্ষিণে পার্ক স্ট্রিট এবং পশ্চিমদিকে হুগলি নদী থেকে পূর্বদিকে সার্কুলার খাল এবং শিয়ালদহ-বালিগঞ্জ রেললাইন পর্যন্ত প্রসারিত।

দক্ষিণ মধ্যাঞ্চল বা শহরতলি এলাকার ব্যাপ্তি উত্তরে এ জি সি বোস রোড, পার্ক স্ট্রিট ও তপসিয়া রোড থেকে পূর্বে বালিগঞ্জ বজবজ রেলপথ। D.W.F. ও S.W.F. খালে বালিগঞ্জ পাম্পিং স্টেশনের মাধ্যম ছাড়া একটি অংশের নিকাশি ব্যবস্থা বর্ষার সময়ে হুগলি নদী দিয়েও হয়।

দক্ষিণাঞ্চল বা যাদবপুর টালিগঞ্জ এলাকার নিকাশি ব্যবস্থার একটা অংশ টালিনালার মাধ্যমে অন্য একটি অংশ টালিগঞ্জ-পঞ্চান্নগ্রাম খালের মাধ্যমে Suburban Head cut-এ নিষ্কাশিত হয়।

পূর্বাঞ্চল বা মানিকতলা এলাকার নিকাশি ব্যবস্থার একটা অংশ ধাপা লক পাম্পিং স্টেশন এবং অন্য অংশটি কেষ্টপুর খাল।

দক্ষিণ শহরতলি বা বেহালা গার্ডেনরীচ এলাকার নিকাশি ব্যবস্থা মণিখালি ও চড়িয়াল খালের মাধ্যমে স্লুইসের মধ্য দিয়ে হুগলি নদীতে যায়।

৮। কলকাতা শহরের নিকাশি ব্যবস্থার প্রকৃতি ও সমস্যা

কলকাতা শহরের জল জমে যাওয়ার সমস্যা অতি প্রকট ও দুর্বিষহ। শহরবাসীর অনেকেরই এ নিয়ে বর্ষার মরশুমে নাকাল হওয়ার অভিজ্ঞতা আছে। এর মূল কারণ শহরের ভূ-প্রাকৃতিক চেহারা। এটি অনেকটা বাটির মতন যেখানে শহরের মধ্যাঞ্চলের মাটি অন্যদিকের তুলনায় নিচু। তাই পাম্পের মাধ্যমে নিকাশি ব্যবস্থা করতে হয়। পূর্বমুখী নিকাশিতে সমস্যা অপেক্ষাকৃতভাবে কম। কিন্তু কিছু কিছু এলাকায় যেমন আমহার্স্ট স্ট্রিট, ঠনঠনিয়া, চিৎপুর, ফ্রি স্কুল স্ট্রিট, ক্যামাক স্ট্রিট, শরৎ বোস রোড ভূগর্ভস্থ পয়ঃপ্রণালির দিক উত্তর-দক্ষিণ মুখী হওয়ায় প্রায়শই সমস্যা দেখা দেয়। শহরের আয়তনে রাস্তার পরিমাণ মোটে ৬-৮% হওয়ায় সমস্যা আরও বৃদ্ধি পায়। অনেক সময়েই বড় বড় বাড়িগুলোর বর্ষার জল পয়োনালি'র (yard gully) মধ্য দিয়ে না গিয়ে অপরিসর রাস্তায় গিয়ে পড়ে। এর উপর রাস্তার পাশে যথেষ্ট পরিমাণ পয়োনালি না থাকায় অথবা যথার্থ রক্ষণাবেক্ষণের অভাবে সমস্যা খুবই প্রকট হয়ে দাঁড়ায়। শহরে নোংরা জল এবং বৃষ্টির জল বার করে দেবার আলাদা ব্যবস্থা না থাকায় ভূগর্ভস্থ পয়ঃপ্রণালি প্রায়শই ময়লা জমে যাওয়ার শিকার। অনেক স্থানে প্রভূত পরিমাণে সঞ্চিত ময়লার জন্য কার্যকারিকা কমে ৩০% গিয়ে দাঁড়িয়েছে।

৯। পাম্পিং ব্যবস্থা

আগেই বলা হয়েছে যে কলকাতা শহরের একটা বিরাট এলাকার নিকাশি ব্যবস্থা পাম্পের মাধ্যমে করতে হয়। এই পাম্পিং ব্যবস্থায় দায়িত্বে রয়েছে কলকাতা পৌরসভা, সেচ ও জলপথ দপ্তর, কে এম ডি এ, কে এম ডব্লিউ এস এ, পূর্ত দপ্তর এবং জনস্বাস্থ্য কারিগরি দপ্তর। শহরের ৯০% জল নিকাশি পাম্পগুলো যেমন পামার বাজার, ধাপা, বালিগঞ্জ রয়েছে কলকাতা পৌরসভার দায়িত্বে। চৌভাগা ও কেওড়াপুকুর পাম্পের দায়িত্বে রয়েছে সেচ ও জলপথ দপ্তর। এ ছাড়া বীরপাড়া, দত্তবাগান, লেক টাউন, তপসিয়া, কুলিয়া, ট্যাংরা, চিংড়িঘাটা, পাগলাডাঙায় কয়েকটি ছোটো পাম্প রয়েছে।

বাগজোলা খাল

নিচের সারণি-৪তে বিভিন্ন পাম্পের অবস্থান, ক্ষমতা এবং সংশ্লিষ্ট দপ্তরের নাম দেওয়া হল :

সারণি-৪

(ক) *প্রধান পাম্পিং স্টেশন*

ক্রম	অবস্থিতি	ক্ষমতা (কিউসেক)	সংশ্লিষ্ট দপ্তর
১।	পামার বাজার স্থাপিত-১৮৭৬	বর্ষার জলের জন্য (Storm water) ৪ x ২৫০ = ১০০০ নোংরা জলের ৮টি পাম্প = ৭০০ (Dry weather discharge) = ১৭০০	কলকাতা পৌরসভা
২।	বালিগঞ্জ স্থাপিত : ১৮৯০	বর্ষার জলের জন্য— ৮৫০ নোংরা জলের জন্য— ৪২৫ ১২৭৫	”
৩।	ধাপা লক স্থাপিত-১৯৫৮	বর্ষার জলের জন্য— ৪০০ নোরাং জলের জন্য— ৮০ ৪৮০	”
৪।	তপসিয়া	২০৫	”
৫।	চৌভাগা (পুরোনো)	৯ x ৫০ = ৫০০	সেচ ও জলপথ দপ্তর
৬।	অতিরিক্ত চৌভাগা	১০ x ৫০ = ৫০০	
৭।	দ্বিতীয় অতিরিক্ত চৌভাগা	১০ x ৫০ = ৫০০ ১৪৫০	”
৮।	কেওড়া পুকুর	৪ x ৫০ = ২০০	”

(খ) *ছোটো পাম্পিং স্টেশন*

ক্রম	অবস্থিতি	ক্ষমতা (কিউসেক)	সংশ্লিষ্ট দপ্তর
১।	বীরপাড়া	৫০	কলকাতা
২।	মাণিকতলা	২৪	পৌর নিগম
৩।	উল্টাডাঙা (পুরোনো)	২০	”
৪।	পাগলাডাঙা	৪০	”
৫।	কালীঘাট	৩৫	”
৬।	কুলিয়া ট্যাংড়া	৩০	”
৭।	লেক টাউন	২১	জলস্বাস্থ্য
৮।	কাশিপুর-দমদম	১৫৬	কারিগরি বিভাগ
৯।	চিংড়িঘাটা	১০০	কে এম ডব্লিউ
১০।	হৃষিকেশ পার্ক	৩০	এস এ

(গ) *লিফটিং / বুশটিং পাম্প*

ক্রম	অবস্থিতি	ক্ষমতা (কিউসেক)	সংশ্লিষ্ট দপ্তর
১।	বেলগাছিয়া (আর জি কর হাসপাতাল)		কলকাতা পৌর নিগম
২।	উল্টোডাঙা (নতুন)	৪ x ৭ = ২৮ ৮ x ৫৫ = ৪৪০ ৪৬৮	”
৩।	মানিকতলা (রাজা দীনেন্দ্র স্ট্রিট) ও বিবেকানন্দ রোড সংযোগস্থল)		”
৪।	নিমক মহল (সার্কুলার গার্ডেনরীচের নিকট)	২ x ৬ = ১২	”
৫।	মোমিনপুর		”
৬।	চেতলা লক স্থাপিত : ১৯২৮	২ x ৫০ = ১০০	”
৭।	যোধপুর পার্ক	২ x ৩ = ৬ ১ x ৬ = ৬ ২ x ১০ = ২০ ৩২	”
৮।	সাদার্ন এভিনিউ		”

১০। অন্যান্য নিকাশি প্রবাহ পথ

এবারে কলকাতা ও তার আশপাশ অঞ্চলের আরও কয়েকটি প্রধান নিকাশি প্রবাহ নিয়ে একটু আলোচনা করা যাক :

সার্কুলার-বেলেঘাটা খাল

সার্কুলার খাল এক সময়ে একটি অত্যন্ত প্রধান নৌ পরিবহন পথ ছিল। এর প্রথম পরিকল্পনা এবং সম্ভাব্য প্রবাহপথ নির্ধারণ করেন টিরেট্টা। কিন্তু লর্ড ওয়েলেসলি কর্তৃক এই প্রস্তাব প্রত্যাখ্যাত হয়। এর পরে ১৮২৪ সালে মেজর সলখ আর একটি প্রস্তাব দেন কিন্তু ১৮২৬ সালে তিনি ইঙ্গো-ব্রহ্ম যুদ্ধে মারা যান। তবে তাঁর পরিকল্পনার উপর ভিত্তি করেই ১৮২৯ সালে এর খননকার্য শুরু হয় এবং ১৮৩৩ সালে সমাপ্ত হয়। চিৎপুর লক এই সময়েই নির্মিত হয়।

নৌ পরিবহনের কথা ভেবে সার্কুলার খালে কোনো ঢাল রাখা হয়নি। চিৎপুর থেকে বেরিয়ে গজনভি সেতুর (আর জি কর হাসপাতাল) কাছে এটি দু-ভাগে বিভক্ত হয় এবং ই এম বাসের কাছে শেষ হয়। এর মোট দৈর্ঘ্য ৮.৫০ কিমি। পূর্বদিকের শাখাটি যেটি নিউ কাট খাল নামে পরিচিত সেটি ভি আই পি রোড ব্রিজ পর্যন্ত প্রসারিত। এই খালটি এখন নিকাশির জন্য ব্যবহৃত হচ্ছে। সার্কুলার খাল হুগলি নদীর সাথে একটি স্লুইস এবং নৌ-লক দ্বারা যুক্ত এবং অন্যদিকে বাইপাশে পূর্ববাহী নিকাশি খাল (Eastern Drainage Channel) এর সঙ্গে যুক্ত।

নিউ কাট-কেষ্টপুর-ভাঙড় কাটা খাল

ক্রমাগত জল পরিবহনের চাপে ১৮৫৫-৫৬ সালে নিউ কাট খাল খননকার্য শুরু হয় এবং ১৮৫৯ সালে শেষ হয়। নৌ-পরিবহনকে আরও উন্নত করার জন্য ১৯০৮-১৯১০ সময়কালে কেষ্টপুর খাল খনন করা হয়। আরাটন চটকলের সামনে উৎপত্তি হয়ে এটি ভাঙর কাটা খালে গিয়ে পড়ে। কেষ্টপুর-ভাঙর কাটা খাল কুলটিগাঙে গিয়ে তার জল নিষ্কাশন করে। খালটির মোট দৈর্ঘ্য ৩৯ কিমি। বর্তমানে লেক টাউন, বাঙুর, দমদম পার্ক, বিধাননগর, রাজারহাট, ভাঙড় ইত্যাদি অঞ্চলের নিকাশি ব্যবস্থা এই খালের মাধ্যমে হয়। কেষ্টপুর খাল বিধাননগরের উত্তরদিকের সীমানা নির্ধারণ করে। এই খাল ব্যবস্থা অতীতে একটি গুরুত্বপূর্ণ নৌ-পরিবহন পথ ছিল এবং এটি 'অন্তঃ সুন্দরবন জলপথ' (Inner Sunderban Route) নামে পরিচিত ছিল এবং তদানীন্তন পূর্ববঙ্গ বা অধুনা বাংলাদেশকে জলপথে যুক্ত করত।

এবারে কলকাতা পৌরসভার অধীন দক্ষিণদিকের নিকাশি প্রবাহ পথ নিয়ে একটু আলোচনা করা যাক :

টালিনালা

টালিনালা প্রধানত একটি নৌপথ হিসেবে ব্যবহৃত হত। উৎসমুখে এবং নির্গমন পথে কোনো স্থানেই নিয়ন্ত্রণের ব্যবস্থা নেই। মেজর উইলিয়াম টলি তখন ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানিতে বাস্তুকারের পদে নিযুক্ত ছিলেন। তিনি আদি গঙ্গার খাতকে ব্যবহার করে নিজস্ব প্রচেষ্টায় ১৭৭৬ সালে একটি সম্ভাব্য নৌ পরিবহন পথের প্রস্তাব উপস্থাপন করেন। ১৭৭৭ সালে ব্যবহারের জন্য এটি উন্মুক্ত করে দেওয়া হয় এবং এখানে পরিবহন কর আদায়ের ব্যবস্থা ছিল। এই খালটির মোট ১৭ মাইল (২৭.৫ কিমি) দৈর্ঘ্যপথ টালির নামাঙ্কিত হয়ে 'টালিনালা' নামে পরিচিত হয়। ১৮০৪ সালে সরকার এটিকে অধিগ্রহণ করে। টালিনালার জল নিষ্কাশনের স্থান ছিল শামুকপোতা বা তাড়দা বন্দরে বিদ্যাধরীতে। এর পরে বড় আকারের নৌ চলাচলের জন্য এটিকে চওড়া করা হয়। কিন্তু প্রচণ্ড জোয়ার ভাঁটার কারণে এর বুকে প্রভূত পরিমাণে পলির সঞ্চার হয় এবং এটিকে বাঁচিয়ে রাখার জন্য পলি অপসারণ ছিল প্রধান কাজ। দক্ষিণ কলকাতা ও শহরতলির বিস্তীর্ণ অঞ্চল যেমন কেওড়া পুকুর, রিজেন্ট পার্ক, বাঁশদ্রোণীর নিকাশি ব্যবস্থার একটি গুরু দায়িত্ব রয়েছে টালিনালার। টালিনালার একটি প্রধান শাখা বোট ক্যানাল। এটি কলকাতা বন্দর অঞ্চলের নোংরা এবং বর্ষার জল বহন করে এবং টালিনালার পলি সঞ্চারের প্রধান উৎস বলা যেতে পারে।

টালিগঞ্জ-পঞ্চান্নগ্রাম খাল

কলকাতা পৌর নিগমের অন্তর্গত সংযুক্ত এলাকা যাদবপুর, সন্তোষপুর, কসবা, তিলজলা ইত্যাদি অঞ্চলের জল নিকাশির ব্যাপারে টালিগঞ্জ-পঞ্চান্নগ্রাম খালের ভূমিকা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। এই জায়গাগুলি অত্যন্ত নিচু এবং প্রায় জলার মত। ১৯৩৪ থেকে ১৯৪০ সালে এই জায়গাসমূহ দিনের পর দিন জলবন্দী হয়ে থাকত। দুর্দশার সীমা থাকত না, বিশেষ করে কসবা, হালতুর মতো স্থান। ১৯৪১ সালে তদানীন্তন টালিগঞ্জ পৌরসভা বর্ষার জমা জলে বের করে দেবার এবং উদ্যোগ নেয় একটি খাল কেটে চৌভাগাতে একটি স্লুইসের মাধ্যমে কয়েক বছর আগের খনন করা S.W.F. Channel এ নিষ্কাশন করে। এর পরে ৩৩.১৫ বর্গ কিমি (১২.৮০ বর্গ মাইল) এলাকার জন্য একটি জল নিকাশি প্রকল্প রচনা করা হয়। এর মধ্যে ২২.৫৩ বর্গ কিমি পরিমাণ এলাকা ছিল শহর বা পৌর এবং ১০.৬২ বর্গ কিমি এলাকা ছিল গ্রামীণ। পৌর ও গ্রামীণ এলাকার জন্য নিকাশি সূচক ছিল যথাক্রমে দৈনিক ৭৫ মিমি (৩") এবং ২০ মিমি (৺") । এই প্রকল্পের সীমানা ছিল পূর্বে বজবজ রেলপথ ও টালিনালা, পশ্চিমে লবণ হ্রদ, দক্ষিণে S.W.F. খাল এবং উত্তরে লবণ হ্রদ। ১৯৭২ সালে প্রকল্পটি রূপায়িত হয়।

টালীগঞ্জ-পঞ্চান্নগ্রাম বা টি পি খালের মোট দৈর্ঘ্য ৬.৭৫ কিমি, এ ছাড়া রয়েছে অন্তবর্তী ৫ কিমি (Intercepting Channel) এবং ১৮ কিমি দৈর্ঘ্যবিশিষ্ট শাখা খালগুলোর নাম BB1, CC1, DD1, EE1, এবং A_1-A_2, A_{-3}-A_4, A_5-A_6।

১৯৬৬-৬৭ সালে প্রথম চৌভাগাতে নির্মিত হয় ৫০ কিউসেক ক্ষমতাবিশিষ্ট ৯টি পাম্প। এর পরে নগরায়ন এবং আরও এলাকা যুক্ত হওয়ায় (মোট ৪৭.৪০ বর্গ কি.মি. নগরায়ন বা ১৮.৩০ বর্গ মাইল)। আরও পাম্প বসান জরুরি হয়ে পড়ে। তাই এর পরে অতিরিক্ত ৫০ কিউসেক ক্ষমতাবিশিষ্ট আরও ১০টি পাম্প বসান হয় এবং সর্বশেষে আরও অতিরিক্ত ১০টি। তাই এখন পাম্পের মোট সংখ্যা ২৯টি এবং ক্ষমতা ১৪৫০ কিউসেক।

এবারে দক্ষিণ শহরতলি এবং গার্ডেনরীচ এলাকার নিকাশি ব্যবস্থা নিয়ে আলোচনা করা যায়। এখানের তৌজি (Ward) নম্বর ১১৫ থেকে ১৩২ এবং ১৩৩ থেকে ১৪১। এখানের নিকাশি ব্যবস্থার মাধ্যম মণিখালি, চড়িয়াল এবং কেওড়া পুকুর খাল।

মণিখালি খাল

৫৪.০০ বর্গ কি.মি. আয়তন বিশিষ্ট মণিখালি জলগ্রহ ক্ষেত্রের দুটি প্রধান নিকাশি প্রবাহপথ রয়েছে, (১) নতুন মণিখালি খাল এবং (২) পুরোনো মণিখালি খাল, এদের দৈর্ঘ্য যথাক্রমে ৬.৯৩১ কি.মি.

এবং ৪.৯৯৮ কি.মি. এবং প্রবাহের পরিমাণ যথাক্রমে ৪৪.১৬ কিউমেক (১৫৫৯ কিউসেক) এবং ৩.৮২ কিউমেক (১৩৪.৮৮ কিউসেক)। দুটি খালই স্লুইসের মাধ্যমে হুগলি নদীতে গিয়ে পড়ে। এই খাল দুটি মহেশতলা পৌর এলাকার মধ্যে পড়ে এবং বর্ষার জল, অপরিশুদ্ধ ময়লা জল ছাড়াও বেগোর খালের জলও পরিবহন করে।

দুটি খালই ঘনবসতিপূর্ণ এলাকার মধ্য দিয়ে যায়। তাই ধস নামার প্রবণতা খুব বেশি এবং বাঁধানোর প্রয়োজনীয়তা রয়েছে। জোয়ার ভাঁটা থাকার জন্য পলি অপসারণেরও বিশেষ প্রয়োজনীয়তা রয়েছে।

চড়িয়াল খাল

চড়িয়াল খালের নিকাশি এলাকার পরিমাণ ১৬৪.৯৮ বর্গ কি.মি. (৬৩.৭০ বর্গ মাইল) যার মধ্যে ১৪১.৬৫ বর্গ কিমি (৫৪.৬৯ বর্গ মাইল) পৌর এলাকা এবং ২৩.৩৩ বর্গ কিমি (৯.০১ বর্গ মাইল) এলাকা গ্রামীণ। ১৭.৫৯ কিমি দৈর্ঘ্যবিশিষ্ট প্রধান খালটি বেহালা থেকে পূর্ব বরিশার মধ্য দিয়ে প্রবাহিত এবং একটি পাঁচ ফোঁকর বিশিষ্ট স্লুইসের মাধ্যমে হুগলি নদীতে গিয়ে পড়ে। ২৮.৩২ কিউমেক (১০০০ কিউসেক) বিশিষ্ট এই স্লুইসটির অবস্থান বজবজ পৌর এলাকার অন্তর্গত চড়িয়ালে। এর অন্তর্গত ৭.০১ কিমি দৈর্ঘ্য বিশিষ্ট আর একটি খাল মিঠাপুকুর থেকে পূজালীর মধ্য দিয়ে প্রবাহিত এবং ৫৬.৩৩ কিউমেক (১৯৮৯ কিউসেক) ও ১০ ফোঁকর বিশিষ্ট স্লুইসের মাধ্যমে হুগলি নদীতে পড়ে। এছাড়া এর মধ্যে রয়েছে বেহালা মতিলাল গুপ্ত রোড থেকে পূর্ব বরিশার মধ্য দিয়ে প্রবাহিত। ১.৯৯ কিঃ মিঃ দৈর্ঘ্য বিশিষ্ট প্রসারিত চড়িয়াল খাল, মোট ৫০.৩২ কি. মি. বিশিষ্ট ১৫টি শাখা খাল এবং ২০টি উপশাখা খাল। বজবজ, বিষ্ণুপুর, মহেশতলা এবং ঠাকুরপুকুর থানা এলাকার জল নিকাশি এই খালগুলির মাধ্যমে হয়।

খালের যথার্থ বহন ক্ষমতা রাখার জন্য সঞ্চারিত পলি অপসারণ বিশেষভাবে প্রয়োজন।

কেওড়াপুকুর খাল

বকেশ্বর, কেওড়াপুকুর, পুঁটিয়ারি অঞ্চলের নিকাশি ব্যবস্থা কেওড়াপুকুর খালের মাধ্যমে হয়। এর মোট জলগ্রহ ক্ষেত্রের পরিমাণ ৩৮.৮৩ বর্গ কিমি এবং দৈর্ঘ্য ৩২ কিমি। এর মধ্যে ৩০ বর্গ কিমি আয়তন এবং ৭.৫ কিমি দৈর্ঘ্য বিশিষ্ট খাল কলকাতা পৌর নিগমের অন্তর্গত এবং কুদঘাটের নিকট টালি নালায় গিয়ে পড়ে। এ ছাড়া অন্য একটি নালার মাধ্যমে ডায়মণ্ডহারবার খাঁড়ির মধ্যে নিকাশি হয়।

এখানেও পলি সঞ্চারের প্রভাবে খালের বহন ক্ষমতা অনেক পরিমাণে কমে গিয়েছে। খালের দুধারে দখলদারি অনুপ্রবেশের ফলে খালের উন্নতিকরণে প্রতিবন্ধকতার সৃষ্টি হচ্ছে। ১৯৬৬-৬৭ সালে ৫০ কিউসেক বিশিষ্ট চারটি পাম্প এর সাহায্যে টালি নালায় জল নিষ্কাশনের ব্যবস্থা করা হয়।

১১। বর্তমানে পরিস্থিতি

বি এন দের বিখ্যাত Kulti outfall scheme ১৯৪৩ সালে অধিগ্রহণ করা হয়। এর পরে শহরের ক্রমাগত জনসংখ্যা বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে এর কিছু পরিবর্তন এবং পরিবর্ধন করা হয় মাঝে মধ্যে। এর পরে দেশ বিভাগের সঙ্গে সঙ্গে প্রচণ্ড জন স্রোতের চাপে ঘোরতর সমস্যার সম্মুখীন হতে হয়। অত্যন্ত বেগে নগরায়ন বৃদ্ধির ফলে নিকাশি খালগুলোর বহন ক্ষমতা কমে যায়। নিকাশি পথ অবরুদ্ধ হয়ে যায়। নেমে আসে ঘোরতর বিপর্যয়। শহর কলকাতা ও তার পার্শ্ববর্তী ঘনবসতিপূর্ণ অঞ্চল প্রায় প্রতি বছরই ব্যাপক বন্যা এবং জলমগ্নের শিকার হয়। কিপলিঙের ভবিষ্যৎবাণীর এক রূঢ় বাস্তবতা দেখা দেয়। জনসাধারণকে এই দুর্দশা থেকে মুক্ত এবং কষ্ট লাঘব করার জন্য চিন্তাভাবনা এবং প্রচেষ্টা নেওয়া শুরু হয়। মাঝে মধ্যেই নিষ্কাশনের স্থান পরিস্কার করা এবং পাম্পের ক্ষমতা বৃদ্ধি করা হয়। কিন্তু এই বিস্তীর্ণ এলাকার জল নির্গমনের একমাত্র পথ কুলটি গাঙ। বর্ষার জল ছাড়াও বিশাল পরিমাণ গৃহস্থালি এবং শিল্পের নিষ্কাশিত বর্জ্যপদার্থ নিষ্কাশিত হয় কুলটি গাঙে। এই বর্জ্যপদার্থ নিষ্কাশনের এবং বিশুদ্ধিকরণের কোনো ব্যবস্থাও নেই। মাছের চাষের জন্য বানতলা নিয়ন্ত্রক গেট থেকে ময়লা জল সরবরাহ করার ফলস্বরূপ বানতলার Sedimentation Tank তার উপযোগিতা হারিয়ে ফেলে। তাই কুলটি গাঙে বিপুল পরিমাণে পলি সঞ্চার হওয়ার সমস্যাও প্রকট হয়ে রইল। এর পরে জোয়ার ভাঁটার কারণে নিকাশি ব্যবস্থাতে একটা শ্লথগতি এসে গেল। সব নিকাশি খালগুলিই যেমন SWF, DWF, ভাঙড়কাটা বা বাগজোলা সবারই নিষ্কাশন মুখ কুলটি গাং। তাই এখানে পাম্প বসান অত্যন্ত জরুরি বলে মনে করা হল।

DWF, SWF, THC সমস্ত নিকাশি খালগুলোই কলকাতা পুরসভা ১.৫। ১৯৬৬ সালে সেচ দপ্তরের উপরের ন্যস্ত করে।

নিকাশি খাল সমূহের বুকে দিনের পর দিন পলি সঞ্চার এবং তার অপসারণের অভাবে বহন ক্ষমতা প্রচণ্ড মাত্রায় কমতে লাগল। এর উপর দুধারে গজিয়ে গড়ে ওঠা বিভিন্ন শিল্প, কারখানা, চর্মজ বর্জ্য পদার্থ এবং কলকাতা সুবিশাল কসাইখানা থেকে ক্রমাগত আবর্জনা পড়তে পড়তে বিশেষ করে Town Head Cut তার উপযোগিতা বিরাট ভাবে হারিয়ে ফেলে। যে উদ্দেশ্যে এই সব নিকাশি খাল খনন করা হয়েছিল, সেখানে লক্ষ্য করা গেল এক চূড়ান্ত ব্যর্থতা। নিকাশি ক্ষেত্রে নেমে আসে এক বিপর্যয় ঘনায়মান সমস্যা তার চরম আকারের রূপ নিল ১৯৯৯ সালের ২৩ থেকে ২৫ সেপ্টেম্বরের মধ্যে যখন কেবল ১০ ঘণ্টায় ৩৩০ মিমি বৃষ্টিপাত হয়। বর্ষণের তীব্রতার ঘনত্ব এত বেশি থাকায় বিস্তীর্ণ অঞ্চল জলমগ্ন হয়ে পড়ে এবং নিকাশিও হয় অতি মৃদু মন্দ গতিতে। এই খালগুলির অপরিসরতা এর অন্যতম প্রধান কারণ বলা যেতে পারে।

ডাঃ পি এন রায়ের সভাপতিত্বে ১৯৯১ সালে একটি উচ্চ পর্যায়ে কমিটির প্রস্তাবনার ভিত্তিতে 'হুগলি নদীর পূর্ব তীরে কলকাতা মহানগরী এলাকার জন্য একটি ব্যাপক জলনিকাশি ব্যবস্থার উন্নয়ন' ('Development of Comprehensive Drainage System in Kolkata Metropolitan Areas on the eastern bank of river Hooghly') শীর্ষক একটি প্রকল্প রচনা করা হয়। West Bengal Infrastructure Development Finance Corporation (WBIDFC) Ltd এর মাধ্যমে ঋণ সাহায্যের মারফৎ এই কার্যভার ন্যস্ত করা হয়েছিল Housing Urban Development Corporation (HUD Cor) কর্ম ভার ন্যস্ত হল সেচ ও জলপথ দপ্তরের ওপর। কলকাতা ও তার পার্শ্ববর্তী এই প্রকল্পের মূল উদ্দেশ্য ছিল নিকাশি খাল সমূহকে তাদের পূর্বতলে পরিসরে নিয়ে আসা এবং বিভিন্ন

প্রতিবন্ধকতা দূর করা। এর অধীনে বিভিন্ন কাজ এবং তাদের আনুমানিক খরচ এইরূপ সরণি-৫ :

সারণি-৫

ক্রম	খাল / নিকাশি এলাকার নাম	আনুমানিক খরচ (লক্ষ টাকায়)
১।	নওয়াই খাল	১৭১৩.২০
২।	উচ্চ বাগজোলা খাল	১৬৭০.০০
৩।	নিম্ন বাগজোলা খাল (কুলটি গাঙ নিষ্কাশন খালের স্লুইস সহ)	৪৬২২.০০
৪।	নিউকাট-কেষ্টপুর-ভাঙড়কাটা খাল	৯৩০.০০
৫।	S.W.F. - D.W.F. খাল	২৯৩৮.০০
৬।	টালিগঞ্জ-পঞ্চান্নগ্রাম খাল (মধ্যবর্তী ও শাখা খাল সমেত)	৬২৫.৯২
৭।	সার্কুলার-বেলেঘাটা খাল	৪৭৫.০০
৮।	চড়িয়াল নিকাশি খালসমূহ	২০০.০০
৯।	মণিখালি নিকাশি খাল সমূহ	৬৫.০০
১০।	বাগের খাল	১৫.০০
১১।	খরদা খাল	৫২০.০০
১২।	ইছাপুর নিকাশি খাল সমূহ	২০.০০
১৩।	যন্ত্রপাতি ক্রয়	২০০.০০
	মোট	১৩৯৮৫.০০
		বা, ১৩৯.৮৫ কোটি টাকা

২০০০ সালের মার্চ মাসে কাজ আরম্ভ হয় এবং খাল খননের কাজ বেশির ভাগ ক্ষেত্রেই এগিয়ে চলেছে। বাগজোলা পাম্পের কাজ কিছুটা বাকি আছে।

টালি নালা

টালি নালার খননকার্য ও উন্নতিকরণকে কয়েকটি ভাগে বিভক্ত করা যায়।

(১) শুরু অর্থাৎ হেস্টিংস থেকে চেতলা বোট ক্যানাল-৫কি.মি.

(২) চেতলা বোট ক্যানাল থেকে কুদঘাটা-৪কিমি

(৩) চেতলা বোট ক্যানাল থেকে ঋষি আশ্রম-৩.৫০ কিমি

(৪) ঋষি আশ্রম থেকে গড়িয়া রেল স্টেশন-৭.০০ কিমি

এর মধ্যে সব জায়গারই কাজই প্রায় শেষ। তবে ঋষি আশ্রম থেকে গড়িয়া রেল স্টেশন পর্যন্ত মেট্রো রেলপথের কাজের সম্প্রসারণের জন্য কাজ কিছুটা ব্যহত হয়েছে এবং যার ফলে বাঁশদ্রোণী, নাকতলা অঞ্চলের মত ঘনবসতিপূর্ণ এলাকায় নিকাশি ব্যবস্থা দারুণভাবে ব্যাহত হচ্ছে। দীর্ঘদিন জল জমে থাকার ফলে সংকট দেখা দিচ্ছে।

১২। বিদ্যুৎ তাড়িত পাম্প স্থাপন

কিছু স্থানীয় অঞ্চলের জমাজল নিষ্কাশনের জন্য সেচ ও জলপথ দপ্তর প্রতি বছর বিশেষ উদ্যোগ নেয়। জল জমে থাকার প্রবণতা যেখানে বেশি বিশেষ করে অপেক্ষাকৃত নিচু এলাকা সেখানে সাময়িকভাবে স্থাপন করা হয় বিদ্যুৎ চালিত পাম্প। এরকম জায়গাগুলি হল :

(১) খরদায় বি টি রোড ও খরদা খালের সংযোগস্থলের উপর দিকে

(২) নিউ ব্যারাকপুরে বি টি কলেজের নিকট ফতেসা খালের উপর দিকে

(৩) ভি আই পি রোডে লেক টাউনের মুখে

(৪) কুদঘাটে কেওড়াপুকুর স্লুইসের কাছে

(৫) ভি আই পি রোডে শ্রীভূমির কাছে পাম্প হয় না কারণ পূর্ত দপ্তরের এখানে একটি পাম্প রয়েছে

(৬) এ ছাড়া চৌভাগা পাম্পিং স্টেশনে ৫২ অশ্বশক্তি বিশিষ্ট ডিজেল চালিত দুটি পাম্প জরুরি প্রয়োজনে মজুত রাখা হয়।

১৩। বাগজোলা খালে পাম্প স্থাপন

কুলটি গাঙে বাগজোলা খালের জল নিষ্কাশনের স্থানে জোয়ার ভাঁটার প্রভাব অত্যান্ত বেশি। সমস্যা সবচেয়ে বেশী সংকুল হয়ে পড়ে সেপ্টেম্বর মাসে যখন সূর্যের বিষুব রেখায় অবস্থানের জন্য জোয়ারের উচ্চতা সর্বাধিক থাকে। বছরের এই সময়টা আবার নিম্নচাপ ও ঘূর্ণিঝড়ের প্রবণতা থাকে। তাই নদী থেকে স্থলের দিকে অর্থাৎ নালার দিয়ে জল প্রবল গতিতে ধেয়ে আসে। এছাড়া প্রবল বৃষ্টিপাতের কারণে নালা থাকে সম্পূর্ণ ভরপুর। এই সব কারণে বিস্তীর্ণ অঞ্চলের নিকাশি ব্যবস্থায় দেখা দেয় প্রবল সংকট। জোয়ারের কারণে জল নিষ্কাশনের পথ সাময়িক ভাবে অবরুদ্ধ হয়ে যায় বিশেষ করে অভিকর্ষ উপায়ে। তাই এই নিষ্কাশনপথে পাম্প স্থাপন অপরিহার্য্য হয়ে ওঠে। কুলটি গাঙে ১০০ কিউসেক বিশিষ্ট ১৪টি এবং ৫০ কিউসেক বিশিষ্ট ৫টি অর্থাৎ মোট ১৬৫০ কিউসেক ক্ষমতাসম্পন্ন পাম্প বসানর কাজ চলছে এবং সমাপ্ত হওয়ার অবস্থায়।

রাজারহাট উপনগরী গড়ে ওঠার তার ৮৫% জলনিকাশি ব্যববস্থা নিম্ন বাগজোলা খালের মাধ্যমে সম্পন্ন হবে। তখন ১০০ কিউসেক বিশিষ্ট আরও ১৯টি পাম্পের প্রয়োজনীয়তা দেখা দেবে।

১৪। নিকাশি নালা সংরক্ষণ

মহানগরী কলকাতা ও তার পার্শ্ববর্তী অঞ্চলের দায়িত্বে থাকা নিকাশি নালা সমূহ পলি সঞ্চারের প্রবণতা অত্যন্ত বেশী। তাই প্রভূত অর্থ ব্যয় করেও যথার্থ সংরক্ষণের অভাবে এই সব নিকাশি পথ তার পূর্ববর্তী অবস্থায় ফিরে আসবে এবং যে উদ্দেশ্যে করা হয়েছিল, তার উপযোগিতা সম্পূর্ণভাবে হারিয়ে ফেলবে। তাই অল্প পলি জমে থাকতেই অন্তত দুই বা তিন বছরের ব্যবধানে খালগুলোকে পলি মুক্ত করা অত্যন্ত জরুরি।

তাই HUDCO ঋণের সহযোগিতায় বিভিন্ন খালে বিভিন্ন স্থানে প্রয়োজনীয় খনন কার্যের জন্য Hydraulic Excavator, খুলে নেওয়া যায় এইরকম pontoon এবং ১০টি dredger এব সাহায্যে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থাকল্পে একটি প্রকল্প রচিত হয়েছে।

১৫। কলকাতা পরিবেশগত উন্নয়ন প্রকল্প

Kolkata Environmental Improvement Project (KEIP)

কলকাতা ও তার পার্শ্ববর্তী অঞ্চলের নিকাশি ব্যবস্থার সার্বিক উন্নয়নকল্পে এগিয়ে এসেছে এশিয় উন্নয়ন ব্যাঙ্ক বা ADB. এর আর্থিক সাহায্যে ১৩৯.২০ কোটি টাকা ব্যয়ে রচিত হয়েছে একটি বৃহদাকার পরিকল্পনা। এই কাজ মূলত কলকাতার দক্ষিণ ও দক্ষিণ শহরতলিতে সীমাবদ্ধ যেমন টালীগঞ্জ-পঞ্চান্নগ্রাম, কেওড়াপুকুর, বেগোর খাল,

মণিখালি, চড়িয়াল নিকাশি এলাকা। এর প্রধান কাজের মধ্যে রয়েছে খাল খননের মাধ্যমে পলি অপসারণ, খাল বাঁধন, সেতু নির্মাণ, পাম্প স্থাপন। মণিখালি এবং চড়িয়ালে প্রস্তাবনা রয়েছে নতুন পাম্প বসানোর, অন্যদিকে চৌভাগা ও কেওড়াপুকুরে পাম্পিং স্টেশনের ক্ষমতা বৃদ্ধি করা। কাজ শেষ হবার লক্ষ্যমাত্রা সময় নির্ধারিত হয়েছে ২০০৭ সাল। এই প্রকল্পের অধীন বিভিন্ন কাজের তালিকা এইরূপ :

সারণি-৬

১। *খাল খনন, সেতু নির্মাণ ইত্যাদি*

টাকার পরিমাণ লক্ষে

বিভিন্ন খাল / বিভিন্ন কার্যাবলী	টালিগঞ্জ-পঞ্চান্নগ্রাম নিকাশি ব্যবস্থা	কেওড়াপুকুর নিকাশি ব্যবস্থা	বেগোর খাল	মণিখালি নিকাশি ব্যবস্থা	চড়িয়াল নিকাশি ব্যবস্থা	মোট
পুনঃ খনন ও পলি অপসারণ	৫০	৯৫	১	১৪৫	৮৭০	১১৬১
খাল বাঁধান	৩৩৫০	৮৩৫	১০০	৭৭০	১৫৯০	৬৬৪৫
সেতু নির্মাণ	৭৫০	১২৯	২০	২০০	৫০০	১৫৯৯
পাম্পিং স্টেশন নির্মাণ	১১১৬	৬৫১	—	৩১০	৩১০	২৩৮৭
মোট	৫২৬৬	১৭১০	১২১	১৪২৫	৩২৭০	১১৭৯২

২। *যান্ত্রিক ও বৈদ্যুতিক কাজ*

চৌভাগা, কেওড়াপুকুর, মণিখালি ও চড়িয়াল পাম্প ও বৈদ্যুতিক সরঞ্জাম	২১২৮
মোট	১৩৯২০ লক্ষ

৩। পূর্ব কলকাতা জলাভূমি

[illegible] কলকাতা শহরের প্রধান দুটি নিকাশি নালা [illegible] ও [illegible] দুটোই [illegible] নিষ্কাশন করার আগে পূর্ব কলকাতার [illegible] জলাভূমি অতিক্রম করে। এই দুটি প্রধান নিকাশি নালার [illegible] জলাশয়ে পলি জমার না হওয়ার উপরে এই জলাভূমির অস্তিত্ব অনেকটাই নির্ভর করছে। তাই জলাভূমি সম্বন্ধে একটা ধারণা থাকা প্রয়োজন।

জলাভূমি বলতে সাধারণত বোঝায় নিচু, নাবাল জলময় স্থান, যেমন খাল, বিল, গাঁথি সরোবর এবং সমসময় জলমগ্ন [illegible] পূর্ণ প্রাকৃতিক পরিবেশের ভারসাম্য বজায় রাখা থেকে ভূপৃষ্ঠের আর্দ্রতা বজায় রাখা, ভূমিক্ষয় রোধ, শীতল আবহাওয়া, বন্যা, খরার তীব্রতা কমান এবং নলকূপ ইত্যাদির সঞ্চারন প্রভৃতি বহু ব্যাপারে জলাভূমির একটি বিশেষ ভূমিকা রয়েছে। জলাভূমি বিভিন্ন রকমের বন্যপ্রাণী যেমন পাখি, সরীসৃপ, উভচর এবং পতঙ্গ এর বসবাসের আধার।

কলকাতা শহরের পূর্বদিকে E.M.By-Pass-এর ধার ঘেঁষে বিস্তীর্ণ হরিৎ প্রান্তর, ছড়িয়ে থাকা একটির পর একটি জলময় স্থান এবং বিভিন্ন প্রকার উদ্ভিদ ও প্রাণী নিয়ে এই মনোরম জলাভূমি কলকাতা মহানগরীর কর্মব্যস্ত ও সদা চঞ্চল জীবন থেকে অতি সন্নিকটেই বলা যায়। এই পূর্ব কলকাতা জলাভূমির অন্যদিকের সীমানা হল কেষ্টপুর ভাঙড়কাটা খাল। আন্তর্জাতিক রামসার কনভেনশন অনুযায়ী সারা বিশ্বে ১২৩৫টি জলাভূমি স্বীকৃত হয়েছে। সারা ভারতে ১৯টি যার অন্যতম পূর্ব কলকাতা জলাভূমি এই মর্যাদা পেয়েছে।

পূর্ব কলকাতা জলাভূমি সৃষ্ট অনেকদিন আগে থেকেই। পশ্চিম হুগলি এবং পূর্বদিকে বিদ্যাধরী নদীর পরিত্যক্ত প্রবাহ পথ বা প্লাবনভূমিতেই সৃষ্টি হয়েছিল এই জলাভূমির। এই বিস্তীর্ণ জলময় স্থান শহরের বাতাসকে দূষিত করার ধূলাবালিকে শুষে নেয়। শহরের নির্গত আবর্জনার ভার কমিয়ে দিয়ে নিষ্কাশন স্থানে কুলটি গাঙে পৌঁছে যায় অনেকটাই বিশুদ্ধ জল। নিকাশি খালগুলোর মাধ্যমে অগভীর জলাশয়ে [illegible] হয়।

[illegible] এই জলাভূমির আয়তন [illegible] এবং [illegible] বিধাননগর। জলাভূমি ক্রমাগত সঙ্কুচিত হয়ে যাচ্ছে দিনের পর দিন। এর ভিতরে এবং আশপাশ অঞ্চলে গড়ে উঠছে এক একটি উন্নয়ন প্রকল্প। অন্যদিকে ই এম বাই পাস একটি বিশাল বাঁধস্বরূপ হওয়ায় জলাভূমিতে জলের প্রবাহে একটি বিশাল প্রতিবন্ধকতার সৃষ্টি হচ্ছে। [illegible] সালের বন্যার প্রকোপ বৃদ্ধি পাওয়া এবং শহর কলকাতার সুদীর্ঘ সময় জলমগ্ন হয়ে থাকার অন্যতম কারণ এটি।

জলাভূমিতে ছড়িয়ে রয়েছে অসংখ্য ভেড়ি সেখানে বহুদিন ধরে চলে আসছে মাছের চাষ।

কলকাতার প্রধান দুটি নিকাশি নালা DWF এবং SWF-কে পুনঃ খনন করে এবং পলিমুক্ত করে একটি সুস্বাস্থ্য পরিবেশ তৈরির আশা করা যায়। জলাভূমি সংরক্ষণ এটি একটি বিশেষ পদক্ষেপ। তবে এখানে সংশ্লিষ্ট রয়েছে বিভিন্ন দপ্তর এবং সকলের ঐকান্তিক প্রচেষ্টা যে প্রচেষ্টায় জলাভূমি বাঁচান সম্ভব হবে। গড়ে উঠবে এক সুস্থ পরিবেশ।

কলকাতা ও তার পার্শ্ববর্তী অঞ্চলের নিকাশি খাল সমূহ এবং তাদের দৈর্ঘ্য তালিকা নিচের সারণিতে দেওয়া হল :

সারণি-৭

ক্রম	নিকাশি খাল	দৈর্ঘ্য (কি.মি)
১।	নোয়াই খাল বরতি থেকে সুতী খালের সংযোগস্থল	২৯.০০
	হাড়োয়াগাঙ (সুতী খাল ও নোয়াই খালের সংযোগস্থল) থেকে কুলটিগাঙ	১২.০০
	(ক) শাখা খাল FB ও CC,	৭.০০
	(খ) ফতেশা খাল	
২।	উচ্চ বাগজোলা খাল	৯.৩০
	শাখা খাল :	
	(ক) উদয়পুর খাল	৫.০০
	(খ) ক্যান্টনমেন্ট খাল	৩.৫০
	(গ) সোনাই খাল	৪.০০
৩।	নিম্ন বাগজোলা খাল	২৯.৫০
৪।	সারকুলার-বেলেঘাটা খাল	৮.৪০
৫।	নিউকাট-কেষ্টপুর-ভাঙরকাটা খাল	৩৯.২০
৬।	S.W.F. নিকাশি ব্যবস্থা তথা Suburban Head cut (SHC), Town Head cut (THC), ধাপালক থেকে SWF এর সাথে সংযোগকারী Feeder Canalএ	৪৪.০০
৭।	D.W.F. Channel	৩৪.০০
৮।	টালিগঞ্জ-পঞ্চান্নগ্রাম খাল	৭.০০
	(ক) মধ্যবর্তী খাল (Interception channel)	৫.০০
	(খ) বিভিন্ন শাখা খাল	১৮.০০
৯।	খড়দা খাল (মহিশপোতা বিল থেকে হুগলি নদী পর্যন্ত)	৭.০০
১০।	মণিখালি খাল	
	(ক) নতুন মণিখালি খাল	৭.০০
	(খ) পুরাণ মণিখালি খাল	৫.০০
১১।	বেগোর খাল (মণিখালির শাখা খাল) এবং তার শাখা খাল	৪.০০
১২।	চড়িয়াল খাল	১৭.৫০
১৩।	চড়িয়াল অপসারিত (diversion) খাল	৭.০১
১৪।	টালি নালা-প্রারম্ভিক খাল-খিদিরপুর ডক থেকে শামুকপোতা বিদ্যাধরী)	২৭.৩০
১৫।	বর্তমান টালি নালা-গড়িয়া রেলসেতু থেকে খিদিরপুর ডক	১৫.৫০
১৬।	কেওড়াপুকুর মূল খাল এবং কেওড়াপুকুর পশ্চিমমুখী খাল	৯.০০
১৭।	বাগের খাল (মথুরা বিল থেকে হুগলি নদী) কাঁচড়াপাড়া ও হালিশহর পৌর এলাকার অন্তর্গত	৭.৪০
১৮।	ইছাপুর খাল (বরতি বিল থেকে হুগলি নদী) এবং শাখা খাল	১০.৫০
	মোট দৈর্ঘ্য	৩৭২.১১ কিমি

উত্তর চব্বিশ পরগনার নোয়াই খাল

ছবি : সাধন পাল

এবারে নিকাশি ব্যবস্থার ক্ষেত্রে কলকাতা ও তার পার্শ্ববর্তী অঞ্চলের বৎসর পরম্পরা ঘটনাবলী নিচের সারণিতে দেওয়া হল :

সারণি-৮

২৪-৯-১৭২৬	কলকাতা পুরসভা স্থাপন-মেয়র, অলডারম্যানের নিযুক্তি ও মেয়র-পরিষদ গঠিত।
১৭৭৭	টালি নালা খনন।
১৭৯০	তারদার কাছে দুদবিবি খাল বা পশ্চিম বিদ্যাধরীকে বেঁধে দেওয়ার মাধ্যমে উত্তমুখর জলপ্রবাহ বন্ধ করা।
১৮০৩	বিভিন্ন নালা ও জলপ্রবাহ নির্ধারণ করার জন্য বড়লাট কর্তৃক একটি উচ্চ কমিটি গঠন।

১৮১৭	বেলেঘাটা খাল খনন।
১৮২৩	১৮.৫ কিউসেক ক্ষমতাবিশিষ্ট পামার ব্রিজ পাম্পিং স্টেশন স্থাপন।
১৮২৯	সারকুলার খাল খনন।
১৮৩২	কলকাতার নিকাশি সমস্যাকল্পে ভূগর্ভস্থ পয়ঃপ্রণালীর পক্ষে কমিটির মতদান।
১৮৩৩	পুরান চিৎপুর লক নির্মাণ।
১৮৫৫-১৮৭৫	ক্লারকের পরিকল্পনা অনুযায়ী ভূগর্ভস্থ নিকাশি ব্যবস্থার রূপায়ন।
১৮৫৯	নিউ-কাট খাল খনন।
১৮৭৫-৯১	কলকাতা পৌরসভার মুখ্য বাস্তুকার কিমবারের পরিকল্পনা অনুযায়ী নিকাশি ব্যবস্থার সম্প্রসারণ।
১৮৮১-৮২	ধাপা ও চিৎপুর লক নির্মাণ।
১৮৯১-৯৬	শহরতলি ময়না নিষ্কাশনের কাজ সম্পাদন।
১৮৯৭-৯৮	ভাঙড় খাল খনন।
১৯০৪	বালিগঞ্জ পাম্পিং স্টেশন চালু।
১৯১০	কেষ্টপুর খালের খনন কাজ শেষ।
১৯১৩	বিদ্যাধরী নদীর চরম অবনতি।
১৯২৮	মাণিকতলা, উলটাডাঙা, বেলেঘাটা, নারকেলডাঙা পাম্পের কাজ শুরু।
১৯৩০	পাগলাডাঙা পাম্প নির্মাণ।
১৯২৯-১৯৪৩	১৯২৯ কলকাতা পৌরসভার বিশেষ আধিকারিকের "Kulti Outfall Scheme" রচনা। ১৯৩৬ ৬৪ লক্ষ টাকার আনুমানিক খরচে প্রকল্পটির সরকারি অনুমোদন প্রাপ্তি। ১৯৪৩ প্রকল্পটি চালু হল।
১৯৩১	তপসিয়া পাম্প স্টেশন নির্মাণ।
১৯৩৬	বেলগাছিয়া নিকাশি পাম্পিং স্টেশন চালু।
১৯৩৮	কুলিয়া তাঁতরা পাম্পিং স্টেশন।
১৯৫৪	চেতলা লক নিকাশি পাম্পিং স্টেশন।
১৯৫৮	ধাপা লক নিকাশি পাম্পিং সেশন ও বীরপাড়া পাম্পিং স্টেশন চালু।
০১-৫-১৯৬৬	কলকাতা নিকাশি খাল ব্যবস্থা কলকাতা পৌরসভা কর্তৃক সেচ ও জলপথ দপ্তরকে হস্তান্তরকরণ।
১৯৬৭	যোধপুর পার্ক পাম্পিং স্টেশন।
১৯৭১	C.M.D.A.'র প্রতিষ্ঠা।
১৯৭২	টালিগঞ্জ-পঞ্চান্নগ্রাম প্রকল্প এবং চৌভাগায় পাম্পিং স্টেশনের কাজ সম্পাদিত।
১৯৮২-৮৬	CMWSA কর্তৃক চিংড়িঘাটায় পাম্পিং স্টেশন নির্মাণ।
২০০০-২০০৪	WBIDFC এর মাধ্যমে ঋণ সাহায্য মারফত HUDCo'র অধীনে "Development of Comprehensive Drainage System in Kolkata Metropolitan Areas on the eastern bank of river Hooghly"-র কর্ম সম্পাদন।
১১-১১-২০০০	টি পি খাল, মণিখালি, চড়িয়াল, কেওড়াপুকুর, বেগোর খাল এর উন্নতিকরণ, পাম্প নির্মাণ ইত্যাদি ব্যাপারে ১৩৯.০২ কোটি টাকার ঋণ বন্দোবস্তের ব্যাপারে এশিয়া উন্নয়ন ব্যাঙ্ক (ADB)'র সাথে সিদ্ধান্ত গ্রহণ। কাজটি Kolkata Environmental Improvement Project (KEIP)'র মাধ্যমে।
১৮-১২-২০০১	ঋণ সমঝোতায় ADB'র সম্মতি দান।
৯-৯-২০০২	ADB'র কাজ শুরু।
০৪-৮-২০০৩	সেচ ও জলপথ দপ্তরের অধীন KEIP'র Project Management Unit (PMU)'র গঠন।

১৭। উপসংহার

কলকাতা শহর বিভিন্ন সমস্যায় জর্জরিত। হুগলি নদীর পূর্ব তীরে শহরের গোড়া পত্তন থেকেই বহু ঘটনার সাক্ষী এই মহানগরী। কিন্তু তাও এই শহর আত্মগরিমায় অম্লান। অন্যান্য সমস্যার মধ্যে নিকাশি সমস্যা এখানে প্রবল। উপরে লিখিত প্রবন্ধের মাধ্যমে সমস্যার তীব্রতা, বিভিন্ন ব্যবস্থা গ্রহণ এবং ভবিষ্যৎ পরিকল্পনার কথা তুলে ধরার চেষ্টা করা হয়েছে। ক্ষেত্রবিশেষে অনেক কাজের পরিবর্তন ও পরিবর্ধন করা হয়েছে। হয়ত অনেক সময়েই তা প্রয়োজনের তুলনায় অপ্রতুল। তাই শহরের জল জমে যাওয়া, যানবাহন বন্ধ হয়ে যাওয়া। ফলস্বরূপ বিভিন্ন পরিষেবার বিঘ্ন হওয়া অনেক শহরবাসীর স্মৃতিপটে বিভীষিকা। আশার কথা রাজ্য সরকার, কেন্দ্রীয় সরকার এবং কিছু আন্তর্জাতিক সংস্থা এই নিকাশি ব্যবস্থার উন্নতিকল্পে এগিয়ে এসেছে এবং সুচিন্তিত মতামতের আদান-প্রদান হচ্ছে। বাস্তুকার, বিজ্ঞানী, পরিকল্পনা, পরিবেশবিদ, গবেষকগণ এবং অন্যান্য সুধীজন এগিয়ে এসেছেন সঠিক রূপরেখা দেবার ব্যাপারে। তবে সাধারণ শহরবাসীর ভূমিকাই এখানে সর্বাগ্রে প্রয়োজন। কারণ আশা রাখতেই হবে, ভেঙে পড়লে চলবে না। তবেই ত আমাদের প্রিয় শহর একদিন হয়ে উঠবে কল্লোলিনী তিলোত্তমা।

REFERENCES

1. Report of the Committee to enquire into drainage Condition of Calcutta and Adjoining Areas-Department of Irrigation & Waterways, 1945.
2. River System of West Bengal
   —River Research Institute, 1969.
3. Calcutta, the Living City, The Present and the Future, Vol. II
   —Edited by Sukanta Chowdhury
   —Oxford University Press, 2000.
4. Various scheme books, publications, reports of I. & W. Deptt.

অঞ্জন দাশগুপ্ত □ অবসরপ্রাপ্ত মুখ্য বাস্তুকার, সেচ ও জলপথ দপ্তর

বন্যা—কিছু ভাবনা

তপনকুমার রক্ষিত

ভাগীরথীর ভাঙন

বন্যা প্রায় প্রতি বছরই পশ্চিমবাংলার কোথাও না কোথাও হচ্ছেই। বর্ষাকাল এলেই মানুষের মনে একদিকে যেমন একটা চরম স্বস্তির নিঃশ্বাস আসে, আবার ঠিক উল্টোটাও মনের মধ্যে ভয়ংকর কষ্টের দিনগুলোকে স্মরণ করিয়ে দেয়। জিজ্ঞাসা থেকে যায় বন্যার কারণ কী, তার থেকে কিভাবে উদ্ধার পাওয়া যায়, আর বর্ষাকালকে চিন্তামুক্ত হয়ে পুরো মন খুলে উপভোগ করা যায়।

নদীপথই একমাত্র পথ যার সৃষ্টিকর্তা হচ্ছে প্রকৃতি, তাই নদীর মতিগতি পুরোটাই প্রকৃতির উপর নির্ভরশীল। যেখানে নদী আঁকাবাঁকা পথ অনুসরণ করে শম্বুকগতিতে চলে তার মতিগতি তো বোঝা আরও কঠিন—যে কোনো কারণেই হোক শম্বুকগতি যদি দ্রুতগতিতে রূপান্তরিত হয় তবে তার চারিত্রিক ভাবধারা সম্পূর্ণ পাল্টে যেতে পারে এবং প্রায় প্রতি বছরেই তা কোথাও না কোথাও হয়ে থাকে।

তারই ফলশ্রুতি মানুষের কাছে নিয়ে আসে দুর্দশা। কিন্তু স্বাভাবিক প্রাকৃতিক নিয়ম ছিল যে, নদী উপরের অংশ থেকে তার বহনক্ষমতাকে সময়ের সঙ্গে এবং পরিবেশের সঙ্গে মানিয়ে নিয়ে জল ও পলিমাটি শেষ প্রান্তে অর্থাৎ সমুদ্রে পৌঁছে দেবে। তাহলে প্রশ্নটা এই যে নদীপথের উপর বাঁধাটা কেন এল, কিভাবে আর কবে থেকে এল।

নদীপথের উপর বাঁধা সৃষ্টির কারণ ব্যাপক বনাঞ্চল ধ্বংসের জন্য ভূমিক্ষয়, জনসংখ্যা বৃদ্ধি আর তার সঙ্গে পাল্লা দিয়ে শহরে বা নগরে জলস্ফীতি।

এবার একটু হিসাবের দিকে দেখা যাক। প্রতি বছর আমাদের দেশে ১.৩ মিঃ হেঃ বনাঞ্চল ধ্বংস হয়ে যাচ্ছে। ১৯৭২-৭৩ সালে ছিল ৪৬.৩২ মিঃ হেক্টর আর ১৯৮০-৮১-তে এসে দাঁড়িয়েছে ৩৫.৭৭ মিঃ হেক্টর। উত্তরবঙ্গে ১৯৮১ সালে ১৪ শতাংশ বনাঞ্চলের মধ্যে ৫০ শতাংশই বিনষ্ট হয়ে গেছে ১৯৯২ সালের মধ্যে যার পরিমাণ ১৪ হাজার হেক্টর। দার্জিলিং জেলায় ১৯১১ সালে বনাঞ্চল ছিল ৫৫ শতাংশ (মাথাপিছু ৬০ হেক্টর), ১৯৭১ সালে তা কমে দাঁড়ায় ২৬ শতাংশ (মাথাপিছু ০.১৯ হেক্টর) আর ১৯৯২ সালে মাথাপিছু ০.০৮ হেক্টর।

পরিবেশ বিজ্ঞানীদের মতে **"এক তৃতীয়াংশ বনাঞ্চল থাকা আবশ্যক"**।

এইভাবে বনাঞ্চল ধ্বংস করার সঙ্গে সঙ্গে ভূমিক্ষয়ের মাত্রা অস্বাভাবিকভাবে বেড়ে গেছে, তারই ফলশ্রুতি, সমস্ত অববাহিকায় নদীর জল ধারণ করার ক্ষমতা সীমিত হয়ে যাচ্ছে। তৈরি করার সময় জলাধারগুলির বার্ষিক পলি জমার হার যা হিসাব করা হয়েছিল তা অনেক বেড়ে গেছে (সারণি-১, সূত্র : ভারত সরকারের সেচ কমিশনের রিপোর্ট উদ্ধৃতি : পিপলস অ্যান্ড ড্যাম-এজেন্ট নিউদিল্লি পৃ-৭৯)

২৭টি বড় শহর, ৩৭১টি ছোট শহর এবং ২৯২টি অন্যান্য শহর, অবস্থিত, আর ভারতবর্ষের অর্থনৈতিক, সাংস্কৃতিক ইতিহাস এর উপরেই দাঁড়িয়ে আছে। ভারতবর্ষের প্রায় ৪৭ শতাংশ সেচসেবিত এলাকা এই নদীর জলেই হয়ে থাকে। প্রায় ১০ কোটি মানুষের বাসস্থান এই এলাকায়।

সারা দেশ জুড়ে যে নগরায়নের পালা চলেছে তার ফলশ্রুতি হিসাবে নগরবাসী মানুষের সংখ্যা অত্যন্ত দ্রুতহারে বেড়ে চলেছে। ১৯২০ সালে নগরবাসী মানুষের অনুপাত ছিল ১৪ শতাংশ, ১৯৮৫ সালে

পার্থক্যটা শহরাঞ্চলে এবং গ্রামাঞ্চলের ক্ষেত্রে প্রায় ১.৫ গুণ।

তাহলে একদিকে জনসংখ্যা বৃদ্ধি, আবার শহরাঞ্চলে মানুষের অনুপাত বেড়ে যাবার ফলশ্রুতি আর তার সঙ্গে সংযুক্ত ব্যাপক বনাঞ্চল নষ্ট আর বালি, মাটি, পাথর সব মিলে মিশে একাকার—বেচারা নদী যাবেই বা কোথায়, আর কোন পথেই বা সে পৌঁছবে সমুদ্রের কাছে। তাই আজ সে দিশেহারা, দিকভ্রান্ত তার নিজের ঠিকানাও সে হারিয়ে ফেলেছে।

এ বার আসা যাক বা দেখা যাক যে, গাঙ্গেয় পশ্চিমবঙ্গে কবে থেকে নদীপথে এই

সারণি-১

জলাধার	বার্ষিক নির্ধারিত পলি ধারন ক্ষমতা একর ফুট	বার্ষিক আগত পলির পরিমাণ একর ফুট	জলাধার	বার্ষিক নির্ধারিত পলি ধারন ক্ষমতা একর ফুট	বার্ষিক আগত পলির পরিমাণ একর ফুট
মাইথন	৬৪৮	৫১৮০	রামগঙ্গা	১০৮৭	৪৩৬৬
পাঞ্চেত	২৯৮২	৯৫৫৩	ভুঙ্গভদ্রা	৯৭৯৬	৪১০৫৮
ময়ুরাক্ষী	৫৩৮	২০০০	ডকাই	৭৪৪৮	২১৭৫৮
ভাকরা	২০০০০	২৩৪৭৫			

হিমালয় সংলগ্ন নদীবাহিত বাৎসরিক পলিমাটির পরিমাণ অনেক বেশি, তিস্তা এন্ডারসন ব্রীজে ১২৫ টন, কর্নানী টিপস নিতে ৬৭ টন, নারায়নী নদীর নারায়ন ঘাটে ৫৬ টন, তানুর ত্রিবেনীতে ৮২ টন।

উত্তরবঙ্গের অভিজ্ঞ সেচ দপ্তরের ইঞ্জিনিয়াররা জানেন যে পাহাড়ে একটা পরিণত গাছ কাটলে বা নষ্ট করে ফেললে প্রায় ১ কিউবিক মিটার পলি (প্রায় ত্রিশটা) আর ৫ কিউবিক মিটার বর্জ্য এবং মোটা বালি নদীর মধ্যে এসে জমা হয়। এই পদ্ধতিটা চলে প্রায় ৮ থেকে ১০ বছর ধরে। তারা এটাও জানেন যে প্রায় প্রতি বছরই প্রায় ১.৫ লক্ষ বোল্ডার নদী থেকে তুলে বিভিন্ন কাজে ব্যবহৃত হয় এবং ৪৫০০ কিউবিক মিটার বর্জ্য আর বালি নদীবক্ষে জমা হয়। তারই ফলশ্রুতিতে উত্তরবঙ্গের সমস্ত নদীই বিকল্প পথের সন্ধানে নিরন্তর চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে।

এবার নগরায়নের দিকটা দেখা যাক। ২৫২৫ কিলোমিটার দীর্ঘ গঙ্গা নদীর দুপাশে

৪১ শতাংশ আর ২০০০ সালে ৪৭ শতাংশ। এর মধ্যে কয়েকটি শহর, নগরের জনসংখ্যা ১ কোটিরও বেশি। এইসব শহর আর নগর থেকে প্রতিদিন যে আবর্জনা এবং অন্যান্য জিনিসপত্র নিক্ষিপ্ত হয় নদীতে তার পরিমাণ অনুমান করলেও আঁতকে উঠতে হয়, **"প্রতিদিন প্রায় ১,০০,০০০ কিউবিক মিটার"** এবং এর বেশির ভাগটাই নদীর বহন ক্ষমতাকে অতি দ্রুত সীমিত করে দিচ্ছে—ফলস্বরূপ নদী তার পথ হারাতে বসেছে এবং বর্ষাকালে তার বহন ক্ষমতা হারিয়ে ফেলছে।

এরপর আবার জলস্ফীতি, যদিও আমাদের দেশেই প্রথম জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণ কর্মসূচী গ্রহণ করা হয় ১৯৫১ সালে প্রথম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায়। আমাদের দেশে বার্ষিক জন্মহার ১৯৫১ সালে প্রতি হাজারে ছিল ৪২ আর ১৯৯২ সালে ২৯। দক্ষিণ কোরিয়া, চীন, তাইওয়ান এবং হংকং-এ সময়ে ছিল যথাক্রমে ৩৭ আর ১৬, ৩৭ আর ১৮, ৪৬ আর ১৬, ৩৩ আর ১২। আবার এই জন্মহারের

বাঁধা বা বিপত্তি সৃষ্টি হয়েছিল, ভূতাত্বিকদের মতই বা কি ?

গঙ্গার বদ্বীপের পশ্চিমদিকে অর্থাৎ পশ্চিমবঙ্গে ভাগীরথী বা হুগলি আর পূর্বদিকে বাংলাদেশের পদ্মা, মেঘনা আবার বাংলার অববাহিকা (Bengal Basin) গঙ্গার পশ্চিম প্রান্ত আর ব্রহ্মপুত্রর পূর্বপ্রান্তে নীচু (sagged) হয়ে যাওয়া এলাকা। হিমালয় পর্বত তৈরি হবার সময় প্রচুর পরিমাণে পলিমাটি, বালি সমুদ্র সংলগ্ন এই এলাকায় জমা হয়েছিল আর রাজমহল গাড়োহিলের ফাঁকা জায়গাটার ভূতত্ত্ববিদরা পৃথিবীর ৩৫০০ মিলিয়ান বছরের (দশ লক্ষ) প্রাণের (Life) সময়টা এইভাবে ভাগ করেছেন সরণি-২-এ।

উপরোক্ত ওই ভাগের সঙ্গে সমন্বয় রক্ষা করেছিল উত্তর পূর্ব দিকে একটা প্রচণ্ড চাপ এবং ভারতীয় উপদ্বীপের মধ্যে নীচু হয়ে যাওয়া প্রস্তর খণ্ডের মাধ্যমে। এই বিশাল এলাকা যেটা পরবর্তীকালেও মাঝে মাঝে নীচু হয়ে যাচ্ছিল তারই নাম বাংলার অববাহিক (Bengal Basin), গঙ্গার বদ্বীপ

বালি জমা করছে। যেহেতু অববাহিকা অঞ্চলে নদীর গতি খুবই কম তাই ঋতু পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে সে বালি আর পলি জমা করছে। যেহেতু অববাহিকা অঞ্চলে নদীর গতি খুবই কম তাই ঋতু পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে সে বালি আর পলি জমা করে আসছে অঞ্চলে (Levee) আবার উপচে পড়ার পর দেখা যায় যে নদী বাঁধের কাছে মোটা বালি জমা হচ্ছে আর সরু বালি বা মাটি অনেক দূরে টেনে নিয়ে যাচ্ছে।

১৯৮৬ সালে কলকাতার দক্ষিণ অঞ্চলে মেট্রো রেলে রেডিও-কার্বন পরীক্ষা করা হয় তাতে দেখা যায় ৪৪০ বছরে পলি জমা পড়েছে ৪.০০ মিটার তারপর ১৭৪০ বছরে পলি জমা হয়েছে ২.২৫ মিটার। এর থেকে বোঝা যায়, পলি-মাটি পড়ার হার কত কমে গেছে। বর্তমানে যা জমা হয় তার বেশি ভাগটাই বালি।

আবার ফিরে তাকানো যাক বেঙ্গল বেসিনের গঙ্গা নদীর পথ পরিবর্তনের কথায়। অববাহিকার নদী, উপ-নদী (tributory) এবং শাখা নদীগুলো (distributory) প্রচুর পলিমাটি আর বালি উপরের অঞ্চল থেকে নিয়ে এসে এই অববাহিকা তৈরি করেছিল। প্রকৃতির মর্জি, ঔদাসীন্য আর মানুষের বিভিন্ন প্রক্রিয়ায় হস্তক্ষেপ নদীগুলোকে আজ দুঃখের নদীতে পরিণত করেছে অথচ এইসব নদীর উপর নির্ভর করেই সৃষ্টি হয়েছিল শিল্প, কৃষি এবং সমাজ। পদ্মা-ভাগীরথী-ব্রহ্মপুত্র এবং দামোদর যেমন পলিমাটি নিয়ে আসে তেমনই আবার পথও পরিবর্তন করে। গঙ্গা পথ পরিবর্তন করে পুরোনো পথ ছেড়ে চলে এসেছে যা আজ ইতিহাস হয়েই আছে আবার হয়তো কোনো নতুন পথের সন্ধানে চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে।

হিউয়েন এন শাঙ ৬৪০ এ ডি-তে কামরূপ থেকে বাংলার উদ্দেশ্যে যাত্রায় পদ্মার কোনো উল্লেখই করেননি, মেগাসথেনিস (৩০০ বি সি) পদ্মাকে একটি চ্যানেল হিসাবে উল্লেখ করেছেন। কিন্তু ১৯৪৭ সালে এন আর বে "বাংলার নদ-নদী বইয়ে বাসুকার Bhasuka) লেখায় পদ্মাকে এগারো শতাব্দীর একটা ক্যানেল (মানুষের কাটা খাল) বলেছেন এবং ফারাক্কার নীচের অংশে অনেক নদীর কথা বলেছেন যা ভাগীরথী নদী থেকে বেরিয়ে বিভিন্ন খাতে বয়ে আবার মূল ভাগীরথী নদীতেই, নীচের অংশে মিশেছিল। এর থেকে অনুমান করা যায় যে মূল যে ঢাল (Slope) সেটা ভাগীরথী খাতেই ছিল এবং গঙ্গা আজকের অবস্থার মতো ভয়ানক ছিল না। **"এর থেকে আরও একটি বিষয়ে উপনীত হওয়া যায় যে বেঙ্গল বেসিনের পূর্বদিকে বেশ বড় ধরনের বসে যাওয়ার ফলেই পদ্মা একটা বড় ধরনের বা মাপের ঢাল পেয়ে যায় এবং আজকের এই বিশালরূপ (আস্তে আস্তে) ধারণ করতে সক্ষম হয়েছে।"**

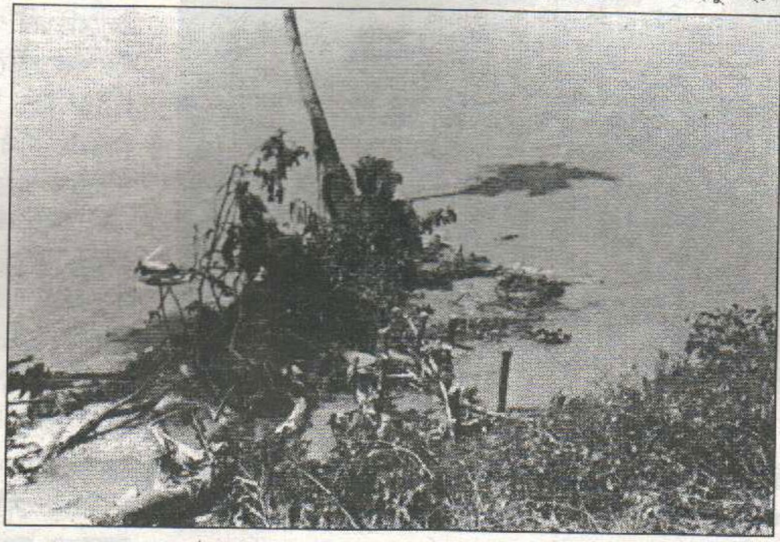

বন্যায় জলের চাপে উপড়ে যাচ্ছে গাছের গোড়া

১৪১৫—১৬ সালে কীর্তিবাস রামায়ণের সংস্কৃত থেকে বাংলায় অনুবাদ করার সময় ভাগীরথীকে ছোটো-গঙ্গা আর পদ্মাকে বড়-গঙ্গা হিসেবে উল্লেখ করেছেন।

বিপ্রদাস তাঁর মনসামঙ্গল বইয়ে (১৫০০ এ ডি) বিখ্যাত ব্যবসায়ী চাঁদ সওদাগরের ভাগীরথী হয়ে সমুদ্র যাত্রাপথের বর্ণনা দিয়েছেন, "বঙ্গ তীর্থস্থান স্পর্শ করে যথা কাটোয়া, গুপ্তিপাড়া, ত্রিবেনী, সপ্তগ্রাম, ভাটপাড়া কাঁকিনাড়া, মহেশ, খড়দহ, শুকচর, আড়িয়াদহ, চিতপুর এবং কলকাতা হয়ে বজরা কালিঘাট অতিক্রম করে চূড়াঘাট, বারুইপুর, ছত্রভোগ, বড়ীকুন্ত, হাতিয়াগড়, চৌমুখী সপ্তমুখি তারপর সঙ্গম যেখানে সমুদ্রের সঙ্গে মিশেছে।

এরিয়াল ফটোগ্রাফি থেকে ভাগীরথীর পুরোনো গতিপথকে অনুধাবন করলে দেখা যায় নদীর দক্ষিণ পশ্চিম গতিপথ ব্যারাকপুরের পর থেকে কলকাতার পূর্ব প্রান্তে বিধাননগরের পশ্চিমপ্রান্তে, সোনারপুর, বারুইপুর হয়ে সম্ভবত রায়মঙ্গল বা হাঁড়িভাঙ্গা চ্যানেল হয়ে সমুদ্রের সঙ্গে মিশেছিল। বিদ্যাধরী এই চ্যানেলেরই অবশিষ্টাংশ (remnant)। বেলেঘাটা আর গোমো ক্যানেল এই বিদ্যাধরী চ্যানেল ব্যবস্থারই (System) অংশ বা পরবর্তীকালে পরিবর্তন ও উন্নত করে ভাগীরথী নদীকে পশ্চিমপ্রান্তে অবস্থিত ফোর্ট উইলিয়ামের সঙ্গে কালীঘাট, টালিগঞ্জ, গড়িয়া, নরেন্দ্রপুর এবং বারুইপুর হয়ে সমুদ্রের সঙ্গে মিশিয়ে দেওয়া হয়। কেনেলের মানচিত্রে অবশ্য (১৭০৪-৭৬) আদিগঙ্গাকে দেখানো হয়নি।

এই রকম একটা অবস্থার মধ্যে আমরা এসে দাঁড়িয়ে আছি যে, বর্ষার জল হুড়মুড়িয়ে এলে আর বেরোবার জায়গা নেই—সমুদ্রে পৌছানো তো দূরের কথা মূল নদীর সঙ্গেই মিশতে পারছে না। যাও বা মিশতে পারছে, সেই নদী বা খালের বহন ক্ষমতা সীমিত হওয়ার দরুন বহুদিন ধরে জল দাঁড়িয়ে থাকছে। যত বছর গড়াচ্ছে অবস্থা ততই খারাপ হচ্ছে। বালি আর পলিমাটি জমতে জমতে (প্রায় দুয় শতক ধরে) নদী সরে গিয়েও বেঁচে আছে তার উপর যোগ হয়েছে জবর দখল। নদীপথ অর্থাৎ উপরের অংশের জল যাতে তাড়াতাড়ি (যতটা সম্ভব।) সমুদ্রে মিশতে পারে তার জন্যেই নদীর উপরের অংশের জল গ্রীষ্মকালে ভাগীরথী নদীর মাধ্যমে প্রবাহিত হওয়া দরকার। ১৯১৮ সালে হুগলি নদীতে গ্রীষ্মকালে প্রায় ১,১০,০০০ কিউসেক জল প্রবাহিত হত বর্তমানে তা কমতে কমতে এসে দাঁড়িয়েছে ১০,০০০ কিউসেকে কারণ উত্তরপ্রদেশে অর্থাৎ **"অববাহিকার উপরের অংশে বাঁধ দিয়ে গ্রীষ্মকালে সেচের জলের চাহিদা মেটানোর পরিবর্তে নীচের অংশের নদীপথ স্তব্ধ। ভাগীরথী নদী এখন জোয়ারের নদীতে (Tidal River) রূপান্তরিত।"**

বালি জমা করছে। যেহেতু অববাহিকা অঞ্চলে নদীর গতি খুবই কম তাই ঋতু পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে সে বালি আর পলি জমা করছে। যেহেতু অববাহিকা অঞ্চলে নদীর গতি খুবই কম তাই ঋতু পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে সে বালি আর পলি জমা করে আসছে অঞ্চলে (Levee) আবার উপচে পড়ার পর দেখা যায় যে নদী বাঁধের কাছে মোটা বালি জমা হচ্ছে আর সরু বালি বা মাটি অনেক দূরে টেনে নিয়ে যাচ্ছে।

১৯৮৬ সালে কলকাতার দক্ষিণ অঞ্চলে মেট্রো রেলে রেডিও-কার্বন পরীক্ষা করা হয় তাতে দেখা যায় ৪৪০ বছরে পলি জমা পড়েছে ৪.০০ মিটার তারপর ১৭৪০ বছরে পলি জমা হয়েছে ২.২৫ মিটার। এর থেকে বোঝা যায়, পলি-মাটি পড়ার হার কত কমে গেছে। বর্তমানে যা জমা হয় তার বেশি ভাগটাই বালি।

আবার ফিরে তাকানো যাক বেঙ্গল বেসিনের গঙ্গা নদীর পথ পরিবর্তনের কথায়। অববাহিকার নদী, উপ-নদী (tributory) এবং শাখা নদীগুলো (distributory) প্রচুর পলিমাটি আর বালি উপরের অঞ্চল থেকে নিয়ে এসে এই অববাহিকা তৈরি করেছিল। প্রকৃতির মর্জি, ঔদাসীন্য আর মানুষের বিভিন্ন প্রক্রিয়ায় হস্তক্ষেপ নদীগুলোকে আজ দুঃখের নদীতে পরিণত করেছে অথচ এইসব নদীর উপর নির্ভর করেই সৃষ্টি হয়েছিল শিল্প, কৃষি এবং সমাজ। পদ্মা-ভাগীরথী-ব্রহ্মপুত্র এবং দামোদর যেমন পলিমাটি নিয়ে আসে তেমনই আবার পথও পরিবর্তন করে। গঙ্গা পথ পরিবর্তন করে পুরোনো পথ ছেড়ে চলে এসেছে যা আজ ইতিহাস হয়েই আছে আবার হয়তো কোনো নতুন পথের সন্ধানে চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে।

হিউয়েন এন শাঙ ৬৪০ এ ডি-তে কামরূপ থেকে বাংলার উদ্দেশ্যে যাত্রায় পদ্মার কোনো উল্লেখই করেননি, মেগাসথেনিস (৩০০ বি সি) পদ্মাকে একটি চ্যানেল হিসাবে উল্লেখ করেছেন। কিন্তু ১৯৪৭ সালে এন আর বে ''বাংলার নদ-নদী বইয়ে বাসুকার Bhasuka) লেখায় পদ্মাকে এগারো শতাব্দীর একটা ক্যানেল (মানুষের কাটা খাল) বলেছেন এবং ফারাক্কার নীচের অংশে অনেক নদীর কথা বলেছেন যা ভাগীরথী নদী থেকে বেরিয়ে

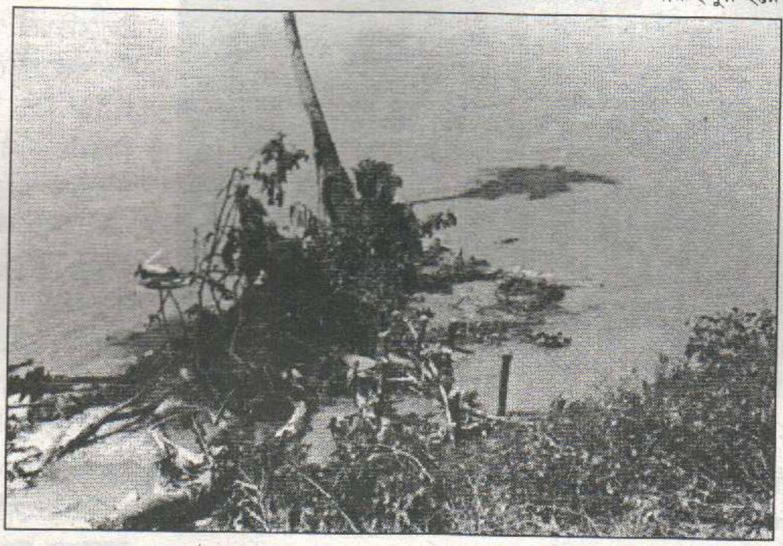

বন্যায় জলের চাপে উপড়ে যাচ্ছে গাছের গোড়া

বিভিন্ন খাতে বয়ে আবার মূল ভাগীরথী নদীতেই, নীচের অংশে মিশেছিল। এর থেকে অনুমান করা যায় যে মূল যে ঢাল (Slope) সেটা ভাগীরথী খাতেই ছিল এবং গঙ্গা আজকের অবস্থার মতো ভয়ানক ছিল না। **“এর থেকে আরও একটি বিষয়ে উপনীত হওয়া যায় যে বেঙ্গল বেসিনের পূর্বদিকে বেশ বড় ধরনের বসে যাওয়ার ফলেই পদ্মা একটা বড় ধরনের বা মাপের ঢাল পেয়ে যায় এবং আজকের এই বিশালরূপ (আস্তে আস্তে) ধারণ করতে সক্ষম হয়েছে।”**

১৪১৫—১৬ সালে কীর্তিবাস রামায়ণের সংস্কৃত থেকে বাংলায় অনুবাদ করার সময় ভাগীরথীকে ছোটো-গঙ্গা আর পদ্মাকে বড়-গঙ্গা হিসেবে উল্লেখ করেছেন।

বিপ্রদাস তাঁর মনসামঙ্গল বইয়ে (১৫০০ এ ডি) বিখ্যাত ব্যবসায়ী চাঁদ সওদাগরের ভাগীরথী হয়ে সমুদ্র যাত্রাপথের বর্ণনা দিয়েছেন, ''বঙ্গ তীর্থস্থান স্পর্শ করে যথা কাটোয়া, গুপ্তিপাড়া, ত্রিবেনী, সপ্তগ্রাম, ভাটপাড়া কাঁকিনাড়া, মহেশ, খড়দহ, শুকচর, আড়িয়াদহ, চিতপুর এবং কলকাতা হয়ে বজরা কালিঘাট অতিক্রম করে চূড়াঘাট, বারুইপুর, ছত্রভোগ, বড়ীকুন্ত, হাতিয়াগড়, চৌমুখী সপ্তমুখি তারপর সঙ্গম যেখানে সমুদ্রের সঙ্গে মিশেছে।

এরিয়াল ফটোগ্রাফি থেকে ভাগীরথীর পুরোনো গতিপথকে অনুধাবন করলে দেখা যায় নদীর দক্ষিণ পশ্চিম গতিপথ ব্যারাকপুরের পর থেকে কলকাতার পূর্ব প্রান্তে বিধাননগরের পশ্চিমপ্রান্তে, সোনারপুর, বারুইপুর হয়ে সম্ভবত রায়মঙ্গল বা হাঁড়িভাঙ্গা চ্যানেল হয়ে সমুদ্রের সঙ্গে মিশেছিল। বিদ্যাধরী এই চ্যানেলেরই অবশিষ্টাংশ (remnant)। বেলেঘাটা আর গোমো ক্যানেল এই বিদ্যাধরী চ্যানেল ব্যবস্থারই (System) অংশ বা পরবর্তীকালে পরিবর্তন ও উন্নত করে ভাগীরথী নদীকে পশ্চিমপ্রান্তে অবস্থিত ফোর্ট উইলিয়ামের সঙ্গে কালীঘাট, টালিগঞ্জ, গড়িয়া, নরেন্দ্রপুর এবং বারুইপুর হয়ে সমুদ্রের সঙ্গে মিশিয়ে দেওয়া হয়। কেনেলের মানচিত্রে অবশ্য (১৭০৪-৭৬) আদিগঙ্গাকে দেখানো হয়নি।

এই রকম একটা অবস্থার মধ্যে আমরা এসে দাঁড়িয়ে আছি যে, বর্ষার জল হুড়মুড়িয়ে এলে আর বেরোবার জায়গা নেই—সমুদ্রে পৌঁছানো তো দূরের কথা মূল নদীর সঙ্গেই মিশতে পারছে না। যাও বা মিশতে পারছে, সেই নদী বা খালের বহন ক্ষমতা সীমিত হওয়ার দরুন বহুদিন ধরে জল দাঁড়িয়ে থাকছে। যত বছর গড়াচ্ছে অবস্থা ততই খারাপ হচ্ছে। বালি আর পলিমাটি জমতে জমতে (প্রায় দুয় শতক ধরে) নদী সরে গিয়েও বেঁচে আছে তার উপর যোগ হয়েছে জবর দখল। নদীপথ অর্থাৎ উপরের অংশের জল যাতে তাড়াতাড়ি (যতটা সম্ভব।) সমুদ্রে মিশতে পারে তার জন্যেই নদীর উপরের অংশের জল গ্রীষ্মকালে ভাগীরথী নদীর মাধ্যমে প্রবাহিত হওয়া দরকার। ১৯১৮ সালে হুগলি নদীতে গ্রীষ্মকালে প্রায় ১,১০,০০০ কিউসেক জল প্রবাহিত হত বর্তমানে তা কমতে কমতে এসে দাঁড়িয়েছে ১০,০০০ কিউসেকে কারণ উত্তরপ্রদেশে অর্থাৎ **“অববাহিকার উপরের অংশে বাঁধ দিয়ে গ্রীষ্মকালে সেচের জলের চাহিদা মেটানোর পরিবর্তে নীচের অংশের নদীপথ স্তব্ধ। ভাগীরথী নদী এখন জোয়ারের নদীতে (Tidal River) রূপান্তরিত।”**

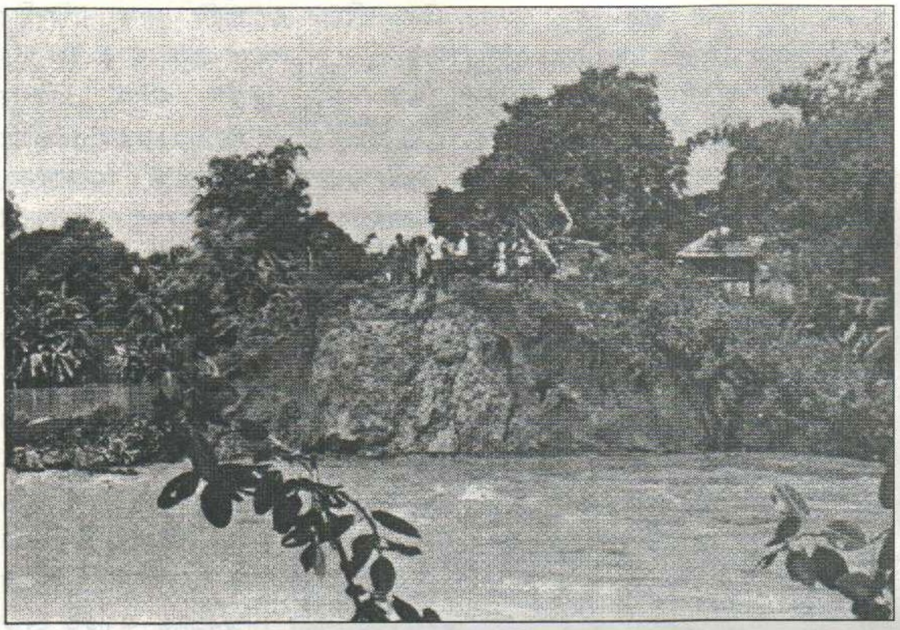

বীরভূমের বন্যা/২০০০ : বাঁধ ভেঙেছে এখানে

নদীপথকে কিছুটা পুরোনো অবস্থায় ফিরিয়ে আনতে হলে অর্থাৎ নদীর বহনক্ষমতা বাড়াতে হলে উচ্চভূমির জলপ্রবাহ (Upland discharge) বাড়ানো অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ আর তার জন্যই দরকার আন্তঃ অববাহিকা স্থানান্তরণ (Inter-Basin and sub-basin transfer).

আরও একটা গুরুত্বপূর্ণ বিষয় যে সেচ এলাকে বাড়াতে গিয়ে ভূস্তরের নীচের চুঁইয়ে এসে নদীতে পরা জলের পরিমাণ অনেক কমে গেছে যার ফলে নদী প্রায় শুকিয়ে যাচ্ছে। **"তাই নদীর গভীরতা না বাড়াতে পারলে বন্যার ছোপল থেকে বাঁচার কোনো রাস্তাই আর নেই।**

ভাগীরথী অববাহিকাকে আমরা নীচে উল্লেখিত কতগুলি উপ-অববাহিকায় ভাগ করতে পারি এবং তার সংস্কার করে ভাগীরথী নদীতে গ্রীষ্মকালে জলের প্রবাহ বেশ কিছুটা বাড়াতে পারি। এগুলি হল :

(১) পাগলা বাঁশলই উপ-অববাহিকা।
(২) জলঙ্গি নদীর উপ-অববাহিকা।
(৩) ময়ুরাক্ষী নদীর উপ-অববাহিকা।
(৪) অজয় নদীর উপ-অববাহিকা।
(৫) ব্রাহ্মণী-দ্বারকেশ্বর নদীর উপ-অববাহিকা।
(৬) দামোদর নদীর উপ-অববাহিকা।
(৭) চূর্নী নদীর উপ-অববাহিকা।
(৮) কালিয়াঘাই নদীর উপ-অববাহিকা।
(৯) শিলাবতী নদীর উপ-অববাহিকা।
(১০) দ্বারকেশ্বর নদীর উপ-অববাহিকা।
(১১) রূপনারায়ণ নদীর উপ-অববাহিকা।
(১২) কংসাবতী নদীর উপ-অববাহিকা।

এছাড়াও পূর্ব কলকাতা এবং দক্ষিণ ২৪ পরগনা উপ-অববাহিকা যথা : পিছলডাঙ্গা, রসুলপুর ও হলদি জল নিষ্কাশন উপ-অববাহিকার বর্ষাকালের অতিরিক্ত জলের এবং গ্রীষ্মকালের ঘাটতি জলের পরিমাপ করে আন্তঃ-অববাহিকার জল স্থানান্তরণের মাধ্যমে কিছুটা নদী প্রবাহ বাড়িয়ে পানীয় জলের সমাধান করতে পারি এবং পরিবেশের উষ্ণতা, আর্দ্রতা নিয়ন্ত্রণ করতে পারি—।

গ্রীষ্মকালের ভাগীরথী নদীতে উচ্চভূমির জলের পরিমাণ বাড়াতে না পারলে কলকাতা এবং দক্ষিণবঙ্গের বেশ কি অংশের পানীয় জলের সমস্যা অতি দ্রু বৃদ্ধি পাবে, কারণ জলস্ফীতি এবং বর্তমা ও ভবিষ্যতের কারখানাগুলির চাহি মেটানোর পরিপূরক হিসাবে, বেশ কয়ে বছর আগেই এই নদীর লবণাক্ত জ উলুবেড়িয়ায় হাওড়া জেলায় পৌঁছে গে যার ফলশ্রুতিতে পরিষ্কার জলের যে আধ মাটির নীচে থাকে তার ক্ষতি হয়েছে আন্তঃ অববাহিকা স্থানান্তরণ ক ফারাক্কা ব্যারেজের মাধ্যমে উচ্চভূমি জল ভাগীরথী নদীতে প্রবেশ করানো অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হয়ে দাঁড়িয়েছে যেমন—

(১) অনেকগুলি ছোটো ছোটো জলাধা ঘড়ঘড়া, গণ্ডক এবং কোশী নদীর উপ তৈরি করে বর্ষাকালের উদ্বৃত জল ধ রেখে গ্রীষ্মকালে ফারাক্কা ব্যারেজ হ ভাগীরথী নদীতে প্রবেশ করানো সম্ভব ফারাক্কায় গঙ্গার জলের ৪৮ শতাংশ নেপা থেকে এই নদী মারফত প্রবাহিত হয় হচ্ছে গঙ্গার জল ব্যবস্থার (System) ২ শতাংশ। নেপালে জলবিদ্যুৎ প্রকল্প এব গ্রীষ্মকালে ফারাক্কার মাধ্যমে ভাগীরথী জলের পরিমাণ বাড়ানো হলে এর ফলে দেশেরই স্বার্থরক্ষা করা সম্ভব।

(২) তিস্তা ব্যারেজ প্রজেক্ট-এ মাধ্যমে পূর্বদিকের উপ-নদীগুলির উপ ছোটো ছোটো জলাধার তৈরি করে মালদ জেলায় গঙ্গা নদীর সঙ্গে যোগ করানো সম্ভব।

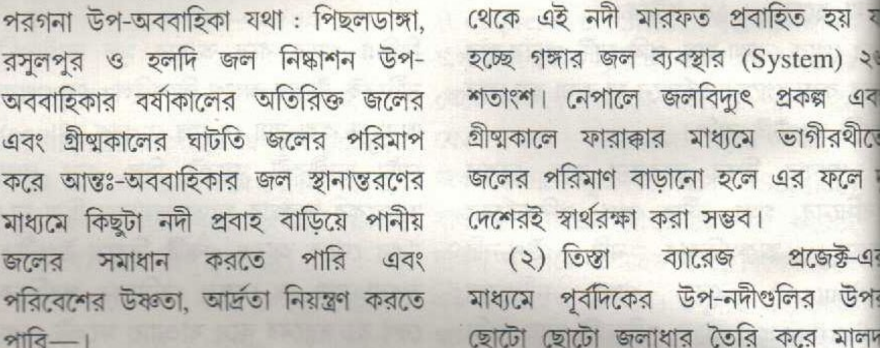

গঙ্গায় বন্যার তোড়। পাড় ভাঙছে মালদহে

(৩) ১৬৬০ সালে ভ্যান-দ্য ব্রুকের মানচিত্রে দেখা যায় যে পদ্মার একটি শাখা নদী দক্ষিণ পশ্চিম দিকে প্রবাহিত হয়ে নদিয়া অতিক্রম করে আমবোনার কাছে ভাগীরথী সংযুক্ত হচ্ছে। একইভাবে ভাগীরথীর একটি শাখা নদী দক্ষিণ পশ্চিম দিকে প্রবাহিত হয়ে দামোদর নদীতে সজনাবাথের কাছে সংযুক্ত হচ্ছে। বর্তমানে এই দুটি শাখা নদীর খোঁজ নেই। এটা অনুমান করা যায় যে প্রথম শাখা নদীটির নীচের অংশটি জলাঙ্গী নদী আর ওপর অংশটি মাথাভাঙা আর মাঝখানের অংশটি জলাশয় (Swamp)। সেই সময় দক্ষিণ দিকে প্রবাহিত ইচ্ছামতী নদীই মূল নদীপথ ছিল আর নীচের অংশের যমুনা আর কালিন্দী ভারত বাংলাদেশের সীমানা নির্ধারিত করত। ভৈরব আর মাথাভাঙা নদী ইছমতী নদীতেই মিশত।

এইসব নদীগুলিকে সংযুক্ত করে পশ্চিম-পূর্ব এবং দক্ষিণ-পূর্ব প্রবাহ স্থির করে ভাগীরথী নদীর প্রবাহ বাড়ানো সম্ভব। বাসুকার লেখায় আছে, এগারো শতকে ফারাক্কার নীচের অংশে ভাগীরথীর অনেক শাখা নদী ভাগীরথী থেকে বেড়িয়ে ঘুরে ফিরে আবার ভাগীরথীতেই মিশত।

(৪) ব্রহ্মপুত্র-গঙ্গা সংযোগকারী পূর্ব পশ্চিম খাল খনন করে ফারাক্কার আগে গঙ্গায় ব্রহ্মপুত্রর জল আনতে পারলে ভাগীরথী নদীর পুনরুজ্জীবন সম্ভবপর। এর ফলে বহু শাখানদী ও উপ-নদীকে উত্তর দক্ষিণমুখীও করা সম্ভব।

এবার একটু অন্যভাবে চিন্তা করা যাক, যা সবারই জানা যে রেলপথ, সড়কপথ মানুষের তৈরি। মানুষ পরিকল্পনা করে যে কোনো স্থান থেকে শুরু করে অন্যত্র যাওয়ার জন্য এইসব যাত্রাপথ তৈরি করে। কিন্তু নদী পথই এর ব্যতিক্রম, প্রকৃতিই এর সৃষ্টিকর্তা, নদীকে সচল রাখতে গেলে এর গতিপথ এবং বহন ক্ষমতাকে টিকিয়ে রাখতে হবেই। ভৌগোলিক বিবর্তনের মাধ্যমে যা ক্ষতি তাকে আটকানো যায় না। কিন্তু মনুষ্য সৃষ্টি বিবর্তনের জন্য নদীর গতিপথ ও বহনক্ষমতা হ্রাস পেলে গোটা সমাজকেই তার শিকার হতে হবে। ভাগীরথী নদীই হচ্ছে পশ্চিমবঙ্গের নদীপথের মূল মেরুদণ্ড। আর এর উপকূলবর্তী এলাকাতেই নিহিত হয়ে আছে বাংলার সমাজ, শিল্প এবং সংস্কৃতি। এই নদী আজ প্রায় মৃতপ্রায় অতি দ্রুতলয়ে এটি তার জীবনের শেষ সীমানায় এসে গেছে। তাই এই নদীকে পুনরুজ্জীবত করতে হলে ছয় শতক আগের অবস্থায় ফিরিয়ে আনার চেষ্টা করা উচিত। সমস্ত নদীর আড়াআড়ি ঢাল (Transverse Slope) ভাগীরথীমুখী করে যাতে বর্ষার যে পরিমাণ জল পদ্মায় পড়ছে তার কিছুটা অংশ আবার এখানে ফিরিয়ে আনা যায়। এই চেষ্টা করা উচিত, কেননা এতে ধীরে ধীরে আড়াআড়ি ঢালেরই পরিবর্তন হবে। অজয়, ময়ূরাক্ষী, দামোদর নদীর ক্ষেত্রেও এটি প্রয়োজন।

গ্রীষ্মকালে উচ্চভূমির জল ভাগীরথী নদীতে অত্যন্ত কমে যাবার পর থেকেই কলকাতা বন্দরে বালির চর (Sand Ber) তৈরি হওয়া শুরু হয় আজ থেকে প্রায় ছ-শতক আগে থেকেই এবং জোয়ার ভাঁটায় বারবার তার অবস্থান পরিবর্তন হয়। নূন্যতম ৩০ ফুট গভীরতা না পেলে কোনো মাঝারি ধরনের মালবাহী জাহাজ চলাচল করতে পারে না। তাই কলকাতা বন্দরের অবস্থা দিনের পর দিন সঙ্গীন হয়ে যাচ্ছে। আবার বর্ষার সময় অত্যধিক পরিমাণে বৃষ্টির জল পশ্চিমবঙ্গে জমা হলে সমস্ত নদীগুলিই দিশেহারা হয়ে যাচ্ছে আর নতুন পথের সন্ধানে ব্যস্ত হয়ে পড়ছে। এই বিপুল পরিমাণ জলরাশিকে এদের সম্ভাব্যস্থানে স্বাভাবিক পথেই পৌছে দেবার দায়িত্ব কিন্তু আমাদেরই। সবার সক্রিয় সহযোগিতা ছাড়া এই কাজ অসম্ভব। আর না করে দিতে পারলে প্রাকৃতিক বিপর্যয় প্রতি বছরই হবার সম্ভাবনা এমনকি গোটা পশ্চিমবঙ্গসহ এই উপমহাদেশে একটা ভীষণ বড় ধরনের প্রাকৃতিক বিপর্যয়ের সম্ভবনাও উড়িয়ে দেওয়া যায় না। We are not aware about the values of a river till it goes dry.

তপনকুমার রক্ষিত □ নির্বাহী বাস্তকার,
সেচ ও জলপথ দপ্তর

কৃতজ্ঞতা স্বীকার :

Evalution of the Biosphere
N. M. Kemshifor
Ecology and Equity by M. G. Gil & R. C. Guha.
জিজ্ঞাসা : মাঘ, চৈত্র সংখ্যা
চতুর্থ সংখ্যা, ১৪০৩
শিব নারায়ণ রায়
Ecology and resource study of the Gugo Detta :
A. K. Basu

পশ্চিমবঙ্গের বিভিন্ন জেলার বন্যাপ্রবণ এলাকা

জেলার নাম	(বর্গ কিমি হিসেবে)	
	ভৌগোলিক এলাকা	বন্যা প্রবণ এলাকা
দার্জিলিং	৩,১৪৯	১২৭
কুচবিহার	৩,৩৮৭	২,০০০
জলপাইগুড়ি	৬,২২৭	৩,০০০
উত্তর দিনাজপুর	৫,৩৫৮	৩,৪৫৮ (উঃ)
দক্ষিণ দিনাজপুর		১,০০০ (দঃ)
মালদহ	৩,৭৩৩	৩,০০০
মুর্শিদাবাদ	৫,৩২৪	২,৮৫৮
বীরভূম	৪,৫৪৫	৩,১৮২
বাঁকুড়া	৬,৮৮২	১১৮
হুগলি	৩,১৪৯	৯১২
হাওড়া	১,৪৬৭	৬০০
পূর্ব মেদিনীপুর		
পশ্চিম মেদিনীপুর	১৪,০৮১	৬,৮২৩
বর্ধমান	৭,০২৪	২,৪৫৮
নদিয়া	৩,৯২৭	৩,৭৩১
পুরুলিয়া	৬,২৫৯	৬৫
২৪-পরগনা (উত্তর)	১৪,১৩৬	৬,৪২৮
২৪-পরগনা (দক্ষিণ)		
কলকাতা (কর্পোরেশন) এলাকা	১০৪	নেই
মোট :	৮৮,৭৫২	৩৭,৭৬০

বৃষ্টিজল সংরক্ষণ ও ব্যবহার

শচীন্দ্রনাথ সাহা

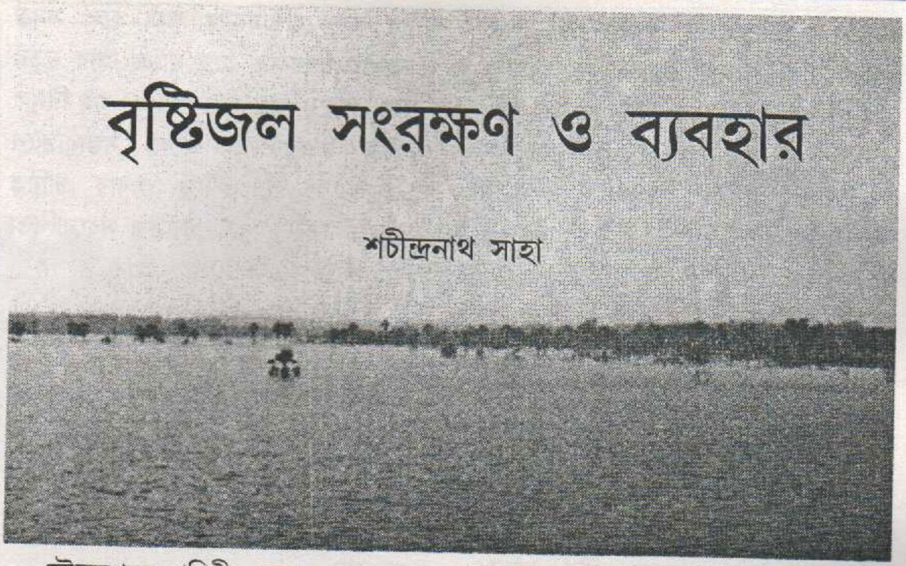

সৌরজগতে পৃথিবী একমাত্র গ্রহ যাকে জল-গ্রহ বলা যায়। এই জল প্রাকৃতিক সম্পদের মধ্যে প্রধান সম্পদ।

জলের আর এক নাম জীবন। জল ছাড়া প্রাণীজগৎ ও উদ্ভিদজগৎ বাঁচাতে পারে না। প্রকৃতির পরিবেশগত ভারসাম্য বজায় রাখতে জলের অবদান অনস্বীকার্য। এছাড়া, কৃষিকার্যে, শিল্পে, তাপবিদ্যুৎ ও জলবিদ্যুৎ উৎপাদনে প্রভৃতি আনুষঙ্গিক কাজে জল একান্তভাবে প্রয়োজনীয়।

জাতিপুঞ্জের হিসাব অনুযায়ী পৃথিবীতে জলের পরিমাণ ১৪০ ঘন কিলোমিটার। পৃথিবীর জলসম্পদের বিভিন্ন অবস্থার আনুপাতিক শতাংশের হিসাব নীচে দেওয়া হল :

১। সাগর ও মহাসাগর ৯৭.২%
২। মেরু অঞ্চল জমাট বাঁধা বরফ ২.১৪%
৩। ভূজল ০.৬১%
৪। নদীনালা, খাল, বিল ইত্যাদি ০.০০৯%
৫। বায়ুমণ্ডল ০.০০৫%

উপরের হিসাব থেকে দেখা যায় যে বিপুল জলসম্পদের মাত্র ২.৭% মানুষের ব্যবহারের উপযোগী। এই জলের ৭৫.২% মেরু অঞ্চলে জমাট বাঁধা বরফের অবস্থায় রয়েছে এবং ২২.৬% ভূস্তরের অভ্যন্তরে ভূজল হিসাবে রয়েছে। বাকি অংশ নদী, নালা, খাল, বিল, মাটি, বায়ুমণ্ডল ও উদ্ভিদের মধ্যে সঞ্চিত থাকে। ভূজলের একটা বড় অংশ মাটির এত গভীরে থাকে যে তা ব্যবহার করা সম্ভব নয়। ভূজল, নদী, নালা, খাল, বিলের একটা মাত্র সামান্য অংশকে মানুষ নিজের কাজে লাগাতে পারে। পৃথিবীর কয়েকটি দেশে বিভিন্ন ব্যবহারের ক্ষেত্রে জলের পরিমাণ (বিলিয়ন কিউবিক মি.) দেওয়া হল :

দেশের নাম	ব্যবহারের ক্ষেত্রে		
	কৃষিকাজ	শিল্প	পানীয় ও গৃহকর্ম
চীন	৪০৪.৬	৯৪.৬	২৬.৩
ভারত	৪৬০.০	১৫.০	২৫.০
আমেরিকা	১২০.৯	২৯১.০	৩৫.৮
জাপান	৫৮.৫	১৫.৫	১৭.৪
ফ্রান্স	৪.৯	২৯.৬	৬.১
মিশর	৪৭.৪	৪.৪	৩.৩

ব্যবহারযোগ্য জলের সামান্য অংশ পুনর্নবীকরণ সত্ত্বেও এর পরিমাণ সীমিত। জনবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে মাথাপিছু ব্যবহারযোগ্য জলের পরিমাণ কমবে। প্রবল জনস্ফীতির ফলে কৃষি, শিল্পায়ন, বিদ্যুৎ উৎপাদন, নগরায়ণ ইত্যাদির প্রয়োজনে জলের ব্যবহার দ্রুত বাড়বে।

নির্ধারিত পরিমাণের অনেক বেশি ভূজল ব্যবহারের ফলে ভূস্তরের জলতল আশঙ্কাজনকভাবে অনেক নীচে নেমে গেছে। এছাড়া, লোকালয় থেকে অশোধিত দূষিত বর্জ্যজল, কলকারখানা থেকে নিঃসৃত দূষিত বর্জ্য জল ও অতিরিক্ত কীটনাশক ও রাসায়নিক সার ব্যবহারের ফলে দূষিত জল নদীতে পড়ে নদীর জলের দূষণমাত্রা বাড়িয়ে দিচ্ছে।

এর ফলে সীমিত জোগান আরও সীমিত হচ্ছে আর পাশাপাশি জনস্ফীতির ফলে বিভিন্ন ক্ষেত্রে জলের চাহিদাকে কয়েকগুণ বাড়িয়ে ব্যবহারযোগ্য জলের যে সামান্য অংশ মানুষ নিজের কাজে লাগাতে পারে, সেই জল অদূর ভবিষ্যতে মহার্ঘ্য ও বিরল বস্তুতে পরিণত হবে।

এই জল সংকট থেকে উদ্ধার পাবার জন্য প্রকৃতির সহজতম ব্যবহারযোগ্য জলের উৎস বৃষ্টির জলকে সঠিকভাবে সংরক্ষণ ও ব্যবহারের দিকে নজর দিতে হবে।

বৃষ্টি একমাত্র উৎস যা ভূপৃষ্ঠের উপর দিয়ে বয়ে যাওয়া জল যেমন নদী, নালা, খাল, বিল, হ্রদ ইত্যাদিতে সঞ্চিত হয় এবং এই বৃষ্টি জলের কিয়দংশ মাটির অভ্যন্তরে চুঁইয়ে ভূজলে পরিণত হয়ে ভূস্তরের জলতলকে উপরের দিকে তুলতে সাহায্য করে।

বৃষ্টি জলের সংরক্ষণের জন্য তিন প্রকার পদ্ধতি অনুসরণ করা হয় (১) ছাদ (২) ভূমি ও (৩) শিলা। সংরক্ষণের পদ্ধতিগুলি সংক্ষেপে বর্ণনা করা হল :

(১) ছাদকে একদিকে ঢালু রাখা হয় এবং ঢালু ছাদের শেষে বৃষ্টির জল সংগ্রহের জন্য খাত বা চ্যানেল রাখা হয় এবং ওই চ্যানেলের শেষপ্রান্তে পাইপের মাধ্যমে জলাধারে বৃষ্টির জল সংগ্রহ করা হয়। (২) ও (৩) ভূমি ও শিলার ক্ষেত্রে একটা বড়ো জায়গার ঢালু প্রান্তে প্রয়োজনে ড্রেনের মাধ্যমে বৃষ্টির জলকে জলাধারে সংরক্ষণ করা হয়।

এ ছাড়া, খাল, নালা, ছোটো নদীতে অস্থায়ী বাঁধ দিয়ে বৃষ্টির জলকে সংরক্ষণ করা যেতে পারে।

বৃষ্টির জল সংরক্ষণের ব্যাপারে নিম্নলিখিত বিষয়গুলি উল্লেখযোগ্য ভূমিকা পালন করে :(১) বৃষ্টির পরিমাণ (২) মাটির বৈশিষ্ট্য (৩) জমির বৈশিষ্ট্য (৪) মাটির অভ্যন্তরে চুঁইয়ে যাবার পরিমাণ (৫) ব্যবহারকারীদের ব্যবহারের ক্ষমতা।

নিম্নলিখিত বিষয়গুলির উপরও বৃষ্টির জল-সংরক্ষণ নির্ভরশীল : (১) অববাহিকা (২) খাত বা চ্যানেলগুলির সংগ্রহ ও বহন ক্ষমতা (৩) জলাধার।

সংরক্ষিত বৃষ্টির জলকে পানীয় জল ও গৃহকর্মের কাজে ব্যবহার করা যেতে পারে। জলাধার সংলগ্ন জমিতে চাষের কাজে বৃষ্টির জল ব্যবহার করা যেতে পারে। ভূস্তরের জলকে সমৃদ্ধ করে এই বৃষ্টির জল।

'বৃষ্টি জল সংরক্ষণ ও ব্যবহার' এর সাফল্য নির্ভর করবে জনজাগরণ কর্মসূচী, প্রদর্শনীর, সভাসমিতি এবং আলোচনার উপর।

সরকারি, পৌরসভা, পঞ্চায়েতের উৎসাহদান, অংশগ্রহণ ইত্যাদির মাধ্যমে 'বৃষ্টি জল সংরক্ষণ ও ব্যবহার'এ জনগণকে অন্তর্ভুক্ত করতে হবে।

শচীন্দ্রনাথ সাহা ❑ অবসরপ্রাপ্ত মুখ্য বাস্তুকার, সেচ ও জলপথ দপ্তর

একটু ভেবে দেখুন

উদয়ন চট্টোপাধ্যায়

২০০০ সালের বন্যার চিত্র : উত্তর ২৪-পরগনা

পুলকবাবু গঙ্গার ধারে বসে আছেন। বড্ড গরম। সময়টা মে মাসের মাঝামাঝি। পড়ন্ত বিকেলে ঠাণ্ডা হাওয়ায় শরীর জুড়িয়ে যায়। এই সময় গঙ্গার ধারে বসে মন-প্রাণ জুড়িয়ে নিতে কে না-চায়।

আমাদের এই পুলকবাবু সদ্য সরকারি চাকরি থেকে অবসরপ্রাপ্ত। জীবনের চৌত্রিশ বছর সময় উনি বন্যা, নিকাশি ইত্যাদি বিষয়ের উপর কাজ করে অনেক কথাই ভাবছেন নদীর দিকে তাকিয়ে। এই নদীর সঙ্গে ওনার বিগত জীবন ওতোপ্রোতভাবে জড়িত। এই নদী কত গভীর ছিল, কত জল বয়ে নিয়ে যেত উনি দেখেছেন। দেখেছেন, উনি যেখানে বসে আছেন সেখানে এক সময় লঞ্চ চলাচল করত। আর এখন সেই নদী অপস্রীয়মান এক স্বপ্ন। ওপারে, মাঝে চর, নদীর গভীরতাও কমে গেছে। কোথায় সেই লঞ্চ। যন্ত্রচালিত নৌকা এখন লঞ্চের জায়গা দখল নিয়েছে। নদীর এই অবস্থার জন্য দায়ী কে ? প্রকৃতি না মানুষ ! ভাবছেন পুলকবাবু। ফারাক্কা চুক্তি, নদীর উপরি ভাগে জলের অনিয়ন্ত্রণ ব্যবহার, কোনটা এর জন্য দায়ী ! কারণ যাই হোক না কেন এই মৃতপ্রায় নদী, নদীর ধারে এই সব শহর কি একদিন ইতিহাসের সভ্যতার মতো অবলুপ্তির পথে যাবে !

নদীর ধারে গঙ্গার হাওয়ায় নিশ্বাস ভরে নিতে মানুষের ভিড় ক্রমশ বাড়ছে। এই ভিড়ের মধ্যে পুলকবাবুর সমকালীন মানুষও যেমন আছেন, তেমনই আছে উঠতি বয়সের প্রাণচঞ্চল কিছু ছেলে এবং মেয়ে। এরা প্রত্যেকেই নিজ নিজ স্বপ্নে আমোদিত, প্রাণোচ্ছল।

আজ পূর্ণিমা। ভরা চাঁদের আলোয় চকচক করছে নদীর জল। জোয়ার আসারও সময় হয়েছে। পুলকবাবু ভাবছেন, জোয়ারটা দেখেই যাবেন। এই সময় জল কতটা উঠছে নদীতে। আজ থেকে কুড়ি-তিরিশ বছর আগে দেখা জোয়ারের সঙ্গে তফাৎ কতটা। পুলকবাবু এবার উঠলেন। হেঁটে হেঁটে এলেন আড়িয়াঘাটের বাঁধানো সিঁড়ির কাছে। নদীতে জোয়ার এসেছে, জল বাড়ছে, একটার পর একটা সিঁড়ি জলের তলায় তলিয়ে যাচ্ছে। গঙ্গা ভরে উঠছে।

স্বপ্নের অপসৃয়মান নদী ভরে উঠছে কানায় কানায়। চরগুলো মিলিয়ে যাচ্ছে, নদী এখন স্বমহিমায়। একটা পরিতৃপ্তির আমেজ নিয়ে বাড়ি ফিরলেন পুলকবাবু।

দশ দিন পরের ঘটনা। গত তিন দিন হল অঝোরে বৃষ্টি হচ্ছে এখানে। সারা শহর জলে ডুবে যাচ্ছে। শহরের জল নামছে না। আশপাশের গ্রাম, সেখানেও একই অবস্থা। সরকারি দপ্তরে ছুটি বাতিল। কাগজে, রেডিওতে বন্যা, বন্যা বলে শোরগোল তুলে ফেলছে।

এমন সময় পুলকবাবুর স্ত্রী ঘরে ঢুকলেন। তাঁর মুখে হাসি। বললেন, 'যাক,

তোমার কোনো দুশ্চিন্তা নেই, ছুটতেও হবে না। চাকরিতে থাকলে কত অশান্তিই না হত। এবার কেউ তোমার দিকে আঙুল তুলে বলতে পারবে না—'কী মশাই আবার বন্যা করলেন।' হঠাৎ দপ করে জ্বলে উঠলেন পুলকবাবু। তাঁর অধিত বিদ্যা-বুদ্ধির মূলে যেন আঘাত হানলেন তাঁর স্ত্রী। তিনি তাঁর স্ত্রীর দিকে স্থির দৃষ্টিতে তাকিয়ে বললেন, 'তুমি কি মনে করো এই বন্যা আমাদের তৈরি !' এইভাবে কথা বলতে পুলকবাবুর স্ত্রী কখনো দেখেননি তাঁকে। এই মানুষটির সঙ্গে প্রায় তিরিশ বছর ঘর করছেন। জীবনের অনেক উত্থান-পতনের সঙ্গে ওতোপ্রোতভাবে জড়িয়ে আছেন তিনি। কিন্তু এই আবেগ ও অভিমান কখনো তিনি আগে দেখেননি। তিনি জানেন তাঁর স্বামী এবং তাঁর সহকর্মীরা এই পরিস্থিতিতে কত সমালোচনার মধ্যে, কত অভিযোগের মধ্যে কাজ করতেন। কিন্তু কেন তাঁর এই অভিমান, কি তাঁর অভিযোগ ?

এবার পুলকবাবুর স্ত্রী তাঁর দিকে তাকিয়ে বললেন, 'আমি জানি এই বন্যা ভগবানের সৃষ্ট পৃথিবীতে এক অনিবার্য পর্যায় মাত্র। কিন্তু এর প্রতিকার কি সম্ভব নয় ? প্রশ্ন তাঁর স্ত্রীর।

পুলকবাবু স্থির হয়ে বসে স্ত্রীকে বসতে বললেন পাশে। তিনি বললেন—এই পৃথিবীতে তিন ভাগ জল, এক ভাগ স্থল। এই স্থলভাগেই বাস করি আমরা, মানে মানুষরা। এই স্থলভাগেই রয়েছে অরণ্য। আর এই অরণ্যেই বাস করে অন্যান্য পশুপাখি। বৃষ্টি পৃথিবীতে অনিবার্য। আর বৃষ্টি আছে বলে সভ্যতা আছে। বৃষ্টিহীনতা মানে খরা, খরা মানে মৃত্যুর হাতছানি। বৃষ্টি কখনো ছন্দে ছন্দে হয় না। বৃষ্টি হয় কখনো বেশি, কখনো কম আবার কখনো একনাগাড়ে প্রবলভাবে। এই বৃষ্টির জল গ্রাম গঞ্জ শহরের মধ্য দিয়ে প্রবাহিত হয়ে শেষে গিয়ে পড়ে নদীতে এবং শেষে সমুদ্রে। মানুষের যেমন হাঁটার পথ আছে, চলার পথ আছে, তেমনি জলেরও যাবার পথ নালা, খাল, বিল ইত্যাদি। এবার বলো—এই জল যাবার পথগুলো সব ঠিক আছে কিনা। প্রশ্ন পুলকবাবুর তাঁর স্ত্রীর প্রতি। আমাদের এই শহরে সব ড্রেনগুলো আজ আর নেই। তার উপর বসে আছে অসংখ্য দোকান আর আছে পরিত্যক্ত আবর্জনার স্তূপ। জল যাবার রাস্তা কোথায় ? ফলে তার যাবার রাস্তা না পেয়ে জনপদে ঢুকে যাচ্ছে তার রাস্তার খোঁজে। আর তাই এই দুর্যোগ। এর জন্য দায়ী কে ? প্রশ্ন পুলকবাবুর।

এবার বুঝতে পারছেন পুলকবাবুর স্ত্রী, কেন এই দুর্যোগ। মানুষের চলার রাস্তা আছে, গাড়ি চলার রাস্তা আছে, সেই রাস্তায় বাধা-বিঘ্ন এলে যেমন হয় পথবিভ্রাট, যানজট, তেমনি জলের চলার রাস্তা বিঘ্নিত হলে হয় এই নিকাশি বিভ্রাট। এতে দোষ কার ? নিশ্চয়ই পুলকবাবুর বা এই জাতীয় লোকের নয়। যদি নালা নর্দমাগুলো পরিষ্কার থাকত, তাহলে থাকত না নিকাশি ব্যবস্থার উপর চেপে বসা অসংখ্য এই দোকান বা গুমটিঘরগুলো, তবে জল তো এই পথেই যেতে পারত, জনপদে ঢুকত না।

পুলকবাবু আবার বলতে শুরু করলেন—এই ব্যাপক বৃষ্টির জল নানা পুকুর, খানা-খন্দ ইত্যাদিতে আটকে থাকে তার চলার পথে কিছুটা আর বাকি অংশ চলে যায় নদীতে। খানা-খন্দ পুকুর বিলের প্রাকৃতিক উপস্থিতি এই নিকাশি ব্যবস্থা বন্যার উপর একটা বড়ো ভূমিকা পালন করে। এরা চলার পথে বেশ কিছুটা জল আটকে রেখে একসঙ্গে একই জায়গায় সব বৃষ্টির বা বন্যার জলকে কেন্দ্রিভূত হতে দেয় না। যার ফলে নিকাশি ব্যবস্থার উপর চাপ অনেকটা কমে এবং সমস্যাটা ব্যাপক গুরুতর আকার ধারণ করার বিপক্ষে কাজ করে। কিন্তু এই সব খানা-খন্দ পুকুর বিল ইত্যাদিকে ব্যাপক হারে ভরিয়ে এই প্রাকৃতিক ব্যবস্থাকে নষ্ট করে মানুষ সমস্যাটা গভীর থেকে গভীরতর করে তুলছে। এর ফলে ভূগর্ভস্থ জলতলের স্থিতিশীলতাও বিঘ্ন হচ্ছে। যার পরিণাম অদূরভবিষ্যতে মারাত্মক হতে পারে।

এবার বুঝতে হবে যেখানে এই জল শেষমেশ পৌঁছয় সেই নদীর অবস্থার সঙ্গে এর সম্পর্ক কেমন। নদী যদি ভরা অর্থাৎ কানায় কানায় জলে পূর্ণ থাকে, তবে নিকাশিত জল নদী নিতে পারবে না। আর তার ফলে এই ব্যাপক জলরাশি নদীতে নামতে পারবে না। ফলে কোনো নিকাশি ব্যবস্থাই কাজ করবে না বা বন্যার জলও নদীতে নামতে পারবে না। ফলে এই সঙ্কটও সহজে দূর হবে না। এটা তো প্রকৃতির স্বাভাবিক নিয়ম। এর জন্যে তো কাউকেই দোষ দেওয়া যায় না। নদীগুলো তো প্রকৃতির স্বাভাবিক নিয়মে বছরের পর বছর উপর থেকে বাহিত পলি পড়ে পড়ে তার স্বাভাবিক জলবহন ক্ষমতা হারিয়ে ফেলছে। এ সঙ্কট সময়ের সঙ্গে সঙ্গে বৃদ্ধি হচ্ছে। এর থেকে পরিত্রাণ পাবার রাস্তাও নেই। যদিও বা এর সুরাহার কিছু করা যায়, তার খরচ এত বেশি যে আমাদের মতো গরিব দেশের পক্ষে সেই ব্যয়ভার বহন করার ক্ষমতাও নেই।

পুলকবাবু এবার একটু থামলেন। এরপর স্ত্রীর দিকে তাকিয়ে আবার বলতে শুরু করলেন—আমরা মানুষেরা যাঁরা এই কাজের সঙ্গে যুক্ত তাঁরা সঙ্কটকে কিছুটা সহজ করে তার লাঘব করার চেষ্টা করি বটে, কিন্তু সেই সঙ্গে সমগ্র জনগণ যাঁরা এর ফলভোগ করবেন তাঁরা যদি এ বিষয়ে সতর্ক না থাকেন এবং শুধুমাত্র একে-ওকে দোষারোপ করতে থাকেন, তার জন্য আর যাই হোক না কেন সমস্যার সুরাহা কখনো হয় না।

এবার একটু দম নিলেন পুলকবাবু। তাঁর চোখ-মুখ দেখে মনে হচ্ছিল তিনি হয়তো তাঁর স্ত্রীকে ব্যাপারটা কিছুটা বোঝাতে পেরেছেন। পুলকবাবু আসলে তাঁর স্ত্রীকে এ জিনিসটি বোঝাতে চাইছেন এমনটি নয়। তিনি তাঁর আক্ষেপ, ক্ষোভ হয়তো অনেককেই বোঝাতে চাইছেন এভাবে বলে। পুলকবাবুর স্ত্রীও বুঝতে পারছেন সে কথা। তিনি এও বুঝতে পারছেন—এ-এক জমে থাকা ক্ষোভের অভিব্যক্তি, যেটা তিনি এভাবে কাউকেই কখনো বলতে পারেননি।

কিছুক্ষণ ঘরের মধ্যে নিশ্চুপ রইলেন দুজনে। হয়তো দুজনেই দুজনকে বোঝার চেষ্টা করছেন। হয়তো পুলকবাবু একটু পরিতৃপ্তও বটে। কারণ তাঁর ঠোঁটে মৃদু হাসি ফুটেছে। আজ তিনি সত্যিই উত্তেজনাহীন, এই সঙ্কটে তাঁর কিছুই করার নেই। একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে পুলকবাবু টিভির সুইচটা অন করে দিলেন। বন্যার খবরে নিমগ্ন হয়ে গেলেন তিনি।

উদয়ন চট্টোপাধ্যায় ❑ নির্বাহী বাস্তুকার, সেচ ও জলপথ দপ্তর

পরিবেশদূষণ প্রতিরোধে বিশুদ্ধিকরণ কেন্দ্রের ভূমিকা

মানিক দে

বর্জ্য ও দূষণেভরা টালির নালা

বর্তমান বিশ্বে পরিবেশ দূষণ সংক্রান্ত যে সমস্যার সৃষ্টি হয়েছে তা সুনিশ্চিতভাবে আমাদের সামাজিক অস্তিত্বকে বিপন্ন করে তুলছে। দ্রুত জনসংখ্যা বৃদ্ধি এবং তজ্জনিত নগরায়ণ স্বাভাবিকভাবেই বিশ্ব পরিবেশকে দূষিত করছে। এই পরিবেশ সুরক্ষায় বা দূষণের ক্ষেত্রে জলের ভূমিকাকে একেবারে উড়িয়ে দেওয়া যায় না।

অনেক প্রাচীন নগরীতে বৃষ্টির জল বহনের জন্য নিকাশি খালের ব্যবস্থা ছিল। প্রাচীন রোমের নিকাশি ব্যবস্থা এক উল্লেখযোগ্য উদাহরণ। এই ব্যবস্থায় বিভিন্ন পাইপ লাইনের মাধ্যমে জল এসে পড়ত বড়ো সুরক্ষিত ঢাকনাযুক্ত খালে, যাকে বলা হত Cloca maxima ('Great Sewer')। এই সুরক্ষিত খালের মাধ্যমে জল এসে পড়ত টিবার নদীতে (Tiber)। মধ্য যুগেও এই নিকাশি ব্যবস্থার খুব একটা উন্নতি হয়নি। Privy Vaults এবং Cesspools ব্যবহৃত হত। ঊনবিংশ শতাব্দীতে বাড়িতেই বাথরুম ও পায়খানার ব্যবস্থা ছিল, কিন্তু বর্জ্য পদার্থ নিকাশি খালে না ফেলে মাটির নীচে ট্যাঙ্কে (Cesspools) জমা করা হত। এর ফলে ঘনবসতিপূর্ণ এলাকায় অস্বাস্থ্যকর পরিবেশ সৃষ্টির সূচনা। ঊনবিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগে ইংল্যান্ডে কলেরার জীবাণুর প্রাদুর্ভাব দেখা গেল কুয়োর জলে। ফলত বড়ো বড়ো শহরে বর্জ্য জল সরাসরি বৃষ্টির জলবাহিত খালের সঙ্গে সংযোগের প্রয়োজন হয়ে পড়ে।

বর্তমান বিশ্বে শহর ও শহরতলির বর্জ্য জল, নতুন নতুন গড়ে ওঠা উপনগরীর বহুতল আবাসনের ব্যবহৃত বর্জ্য জল ও আবর্জনা নিকাশি খালের মাধ্যমে গিয়ে পড়ছে নদীতে। এছাড়া ছোটো বড়ো কল-কারখানার বর্জ্য পদার্থের অংশ ও বর্জ্য জল সরাসরি ফেলা হচ্ছে নিকাশি খালে। ফলত খালের জল খুব দ্রুত দূষিত হয়ে উঠছে। এই জল নদীতে মিশে যাওয়ার ফলে যেমন নদীর জল দূষণমুক্ত থাকছে না, অপরদিকে তেমন জলজ প্রাণী, মাছ ইত্যাদির পক্ষেও ক্ষতিকারক হয়ে উঠছে।

Fig.–1 : LAYOUT OF BAGJOLA SEWERAGE TREATMENT PLANT

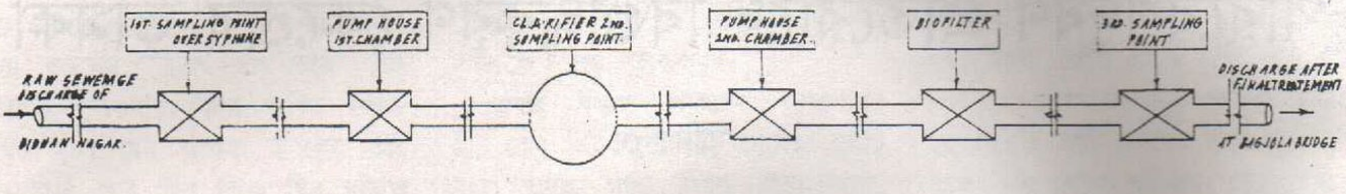

সুন্দর পরিবেশ সুরক্ষার ও সুষ্ঠু পরিচালনার উদ্দেশ্যে শহর, শহরতলির উপনগরী ও আবাসনের বর্জ্য জল, কল-কারখানার বর্জ্য পদার্থের অংশ, বর্জ্য জল সঠিক পদ্ধতিতে শোধনের পর নিকাশি খালে বা নদীতে ফেলা উচিত। এর জন্য প্রয়োজন দূষিত বর্জ্য জলের পুঙ্খানুপুঙ্খ পরীক্ষা ও গবেষণার।

বর্জ্য জল শোধনের আধুনিকীকরণ

যদি অল্প পরিমাণ বর্জ্য জল (Sewage / waste water) নিয়মিত নিকাশি খাল বা নদীতে ফেলা হয়, তবে স্বাভাবিক পদ্ধতিতেই বর্জ্য জলের বিশুদ্ধিকরণ ঘটে যায়। কিন্তু খুব ঘন জনবসতিতে বর্জ্য জলের পরিমাণ এত বেশি হয়ে ওঠে যে স্বাভাবিক পদ্ধতিতে দূষণমুক্তিকরণ সম্ভব হয়ে ওঠে না। ফলত বর্জ্য জলের বিশুদ্ধিকরণ (Treat or purity) প্রয়োজনীয় হয়ে ওঠে। মূলত উনবিংশ শতাব্দীর শেষার্ধে এবং বিংশ শতাব্দীর প্রথমার্ধে বর্জ্য জল শোধনের জন্য বিশুদ্ধিকরণ কেন্দ্রের (Sewage treatment or water pollution control plants) তৈরি শুরু হয়, প্রধানত United Kingdom এবং United States-এ।

গুণগত দিক থেকে দেখলে তিন রকমের বর্জ্য জল (waste water or sewage) পরিবেশকে দূষিত করছে : আবাসনের বর্জ্য জল (Domestic sewage), কল-কারখানার বর্জ্য জল (Industrial sewage) এবং বৃষ্টির জল (Storm sewage)। বর্জ্য জলে বিভিন্ন জৈব পদার্থ (Organic Material), দ্রবীভূত পদার্থ (Dissolved solids) ও নিলম্বিত পদার্থের (Suspended solid) সঙ্গে বিভিন্ন রোগের জীবাণু (Disease—causing microbes) মিশ্রিত থাকে। বর্জ্য জলে জৈব পদার্থের পরিমাণ মাপা হয় B O D-র (Biochemical Oxygen Demand) সাহায্যে। বর্জ্য জলে জৈব পদার্থ যত বেশি হবে B O D তত বেশি হবে। কল-কারখানার বর্জ্য জলে B O D-র মাত্রা আবাসনের বর্জ্য জল থেকে অনেক বেশি হতে পারে। বিশুদ্ধিকরণ কেন্দ্র খোলার পরিকল্পনা ও পরিচালনার সময় B O D নিয়ন্ত্রণের এক উল্লেখযোগ্য ভূমিকা থাকে। হ্রদ ও নদীর জলের গুণগত মান নির্ভর করে দ্রবীভূত অক্সিজেনের (Dissolved oxygen, D O) পরিমাণের উপর। জলে দ্রবীভূত অক্সিজেনের পরিমাণ যত বেশি, জলের গুণগত মান তত ভালো। জৈব পদার্থ বিভাজনের (decomposition) সময় অক্সিজেনের প্রয়োজন হয় ফলত দ্রবীভূত অক্সিজেনের (D O) মাত্রা ধীরে ধীরে এত নীচে নেমে যায় যে জলজ প্রাণী ও মাছেদের জীবন সংশয় হয়ে ওঠে। D O-র শূন্যে নেমে গেলে জল বিষাক্ত (septic) হয়ে উঠবে। ভাসমান পদার্থ (suspended solids) বর্জ্য জলের অন্য এক বিশেষ উপাদান। বৃষ্টি ও কলকারখানার বর্জ্যজলে নিলম্বিত পদার্থের পরিমাণ অনেক বেশি থাকে। কোনও বিশুদ্ধিকরণ কেন্দ্রের কার্যকারিতা কতখানি উপযোগী তা মূলত নিলম্বিত পদার্থ অবসারণ ও BOD নিয়ন্ত্রণ করার ক্ষমতার উপর নির্ভর করে।

শোধন প্রক্রিয়া প্রধানত তিন প্রকারে করা হয়ে থাকে। প্রাথমিক শোধন (Primary treatment)

এই প্রক্রিয়ায় প্রধানত ভাসমান ও বহমান পদার্থ বর্জ্যজল থেকে অপসারণ করা হয়। কতগুলি লম্বা পাশাপাশি অবস্থিত ধাতব দণ্ড ছাকনির কাজ করে। এর মাধ্যমে ভাসমান কাঠের টুকরো, বড় ভাসমান পদার্থ বর্জ্যজল থেকে পৃথক করা হয়। এই পদ্ধতিকে Screening বলা হয়।

এরপর এই বর্জ্যজলকে গ্রীট কক্ষের (Grit chambers) মধ্যে দিয়ে চালনা করা হয়। গ্রীট কক্ষ হল কতগুলো সরু লম্বা জলাশয় (tank) যেখানে বিভিন্ন পদার্থ যেমন বালি, ডিমের খোসা ইত্যাদি জমা হয়ে যায়। যে ভাসমান পদার্থ স্ক্রিণ (Screens) ও গ্রীটের (Grit) মধ্য দিয়ে বেরিয়ে আসে তা অপসারণ করা হয় সেডিমেন্টেশন ট্যাঙ্কে (Sedimentation tank)। এই ট্যাঙ্কগুলোকে প্রাথমিক ক্ল্যারিফায়ারও (Primary clarifiers) বলা হয়। শতকরা ৬০ ভাগ ভাসমান পদার্থ এবং প্রায় শতকরা ৩৫ ভাগ BOD প্রাথমিক শোধন প্রক্রিয়ায় অপসারিত হয়। দ্রবীভূত দূষণীয় পদার্থ এ-প্রক্রিয়ায় অপসারিত হয় না।

দ্বিতীয় পর্যায় শোধন (Secondary treatment)

প্রাথমিক পর্যায়ে শোধিত বর্জ্যজলের অবশিষ্ট নিলম্বিত পদার্থ, জৈবিক পদার্থ দ্বিতীয় পর্যায়ে শোধন করা হয়। মূলত তিন পর্যায়ে জৈবিক শোধন প্রক্রিয়া ব্যবহৃত হয়। Trickling filter, Activated sludge proun এবং Oxidation pond.

Trickling filter :

ট্রিকলিঙ ছাকনি আদতে একটি পাথর ভর্তি ট্যাঙ্ক। বর্জ্যজল ট্যাঙ্কের পাথরের উপর ফোয়ারার মতো ক্রমাগত ছড়ানো হতে থাকে। পাথরের মধ্য দিয়ে জল সেটলিঙ ট্যাঙ্কে (Settling tank) প্রবেশ করে একে অনেক সময় দ্বিতীয় পর্যায়ের ক্ল্যারিফায়ার (Secondary Clarifiers) বলে।

Active Sludge :

এই পদ্ধতিতে বর্জ্যজল acration tank-এ প্রবেশ করে। ট্যাঙ্কের নিচ থেকে হাওয়া জলের মধ্য দিয়ে উপরে উঠতে থাকে। ফলত বর্জ্যজলে অক্সিজেনের মিশ্রণ ঘটতে থাকে।

Oxidation pond :

এটি আসলে বড় অগভীর জলাশয়। এখানে বর্জ্যজল শোধিত করা হয় সূর্যালোক, ব্যাকটেরিয়া (bacteria) ইত্যাদির সাহায্যে। দ্বিতীয় পর্যায়ে শোধন দ্বারা প্রায় ৮৫ শতাংশ নিলম্বিত পদার্থ ও BOD অপসারিত করা হয়।

তৃতীয় পর্যায়ে শোধন (Tertiary treatment) :

এই পর্যায়ে শোধনের দ্বারা নাইট্রেট (Nitrate) এবং ফসফেট (Phosphate) এর মাত্রা বর্জ্যজল থেকে কমানো হয়। এই পর্যায়ে প্রায় ৯৯ শতাংশ দূষণ (impurities) অপসারিত করা যায়। অবশ্য এই প্রক্রিয়া খুবই ব্যয়বহুল।

সব রকম পর্যায়ে শোধনের পর শোধিত জলকে খালে বা নদীতে ফেলার আগে জীবাণু মুক্ত (disinfection) করা প্রয়োজন। শোধিত জলকে এক জলাশয়ের মধ্যে চালনা করে ক্লোরিন গ্যাস মিশ্রণ করা হয়। ক্লোরিন জল-জপ্রাণীর পক্ষে ক্ষতিকারক, ফলত ক্লোরিন মুক্ত (dechlorinate) করার জন্য জলে প্রয়োজনীয় রাসায়নিক দ্রব্য মেশানো হয়। জীবাণু মুক্ত করার জন্য আজকাল অবশ্য Ultra violet radiaton-এর খুব ব্যবহার হচ্ছে।

বিধাননগর পূর্ব এলাকায় নর্দমাবাহিত দূষিত বর্জ্যজল বিশুদ্ধকরণের জন্য বাগজোলা বিশুদ্ধিকরণ কেন্দ্র (Bagjola Sewage Treatment Plant) স্থাপন করা হয়। এই শোধন কেন্দ্রটিতে বর্জ্যজল ক্ল্যারিফায়ার এবং বায়ো-ফিল্টারের সাহায্যে শোধন করা হয়। এই শোধন কেন্দ্রটির উপযোগিতা পরীক্ষার জন্য এখানে নদী বিজ্ঞান মন্দিরের একটি পরীক্ষাগার আছে। কেন্দ্রটিতে বর্জ্যজল ও শোধিত জলের গুণগত মান পরীক্ষার জন্য মোট তিনটি স্থানে জলের নমুনা সংগ্রহ করা হয়। (১নং চিত্র দ্রষ্টব্য)।

প্রথম নমুনা সংগ্রহ করা হয় ক্ল্যারিফায়ারের প্রবেশের মুখে, দ্বিতীয়টি ক্ল্যারিফয়ারের মাধ্যমে আংশিক শোধনের পর এবং তৃতীয় নমুনা সংগ্রহ করা হয় সমস্ত রকমভাবে শোধনের পর। অবশেষে শোধিত জল বাগজোলা খাল বাহিত হয়ে বিদ্যাধরী নদীতে পড়ে।

দীর্ঘদিন ধরে নিলম্বিত পদার্থ (Suspended Solids), দ্রবীভূত অক্সিজেন (DO) এবং BOD এই তিনটি প্রাথমিক ও অতিপ্রয়োজনীয় বিষয়ের উপর দৈনিক তথ্য সংগ্রহ করা হচ্ছে।

চার বছরের সংগৃহীত রাশিমালার উপর রাশিবিজ্ঞানের বিভিন্ন পদ্ধতি প্রয়োগ করা হয়েছে। অপরিশোধিত বর্জ্যজলের BOD-র পরিমাপ ৩৯ পি পি এম (39 ppm) থেকে ৫৭ পি পি এম। ঋতুগত সূচক (Seasonal indices) থেকে এটা পরিষ্কার যে বিভিন্ন মাসে BOD-এর উল্লেখযোগ্য কোনও পার্থক্য নেই। Analysis of Variance-এর সাহায্যে মাসিক রাশিমালার বিশ্লেষণ করে নমুনা সংগ্রহের তিনটি স্থানের উল্লেখযোগ্য পার্থক্য পরিলক্ষিত হয়েছে। এর থেকে এই সিদ্ধান্ত নেওয়া যায় যে বর্জ্যজলের গুণগত মানের উন্নতিসাধনে বিশুদ্ধিকরণ কেন্দ্রের যথাযথ ভূমিকা আছে।

বিভিন্ন নিকাশি খাল ও নদী দ্রুত দূষিত হয়ে পড়ছে। এর জন্য নিকাশি খাল বা নদীতে পড়ার আগেই বর্জ্যজল শোধন করা প্রয়োজন। নতুন নতুন প্রয়োজনীয় বিশুদ্ধিকরণ কেন্দ্র খোলা এবং শোধিত জলের গুণগত মান রুটিনমাফিক পরীক্ষার প্রয়োজন আছে। জলের বিশুদ্ধতা রক্ষা করা এক বড় সমস্যা। কেননা কলকাতার বিভিন্ন খালগুলোতে লক্ষ করলে দেখা যায় খালে বিভিন্ন জীবজন্তুর দেহাবশেষ ভেসে যাচ্ছে। এছাড়া খালের পাড় দিয়ে পর পর খাটা পায়খানা রয়েছে। ফলত যে কোনও সময় রোগ মহামারীর আকার নিতে পারে। এর জন্য দরকার সরকারি ও বেসরকারি স্তরে উদ্যোগ ও প্রচার। বিভিন্ন N.G.O., ক্লাবগুলোর জলের দূষণ রোধে প্রচারে এগিয়ে আসা উচিত। প্রত্যেকটি কলকারখানার বর্জ্যজল, বর্জ্যদ্রব্য খালে ফেলার আগে উপযুক্তভাবে শোধন করা প্রয়োজন। এর জন্য বেসরকারি ও ব্যক্তিগত স্তরেও সচেতনতা ও উদ্যোগ আবশ্যক।

মানিক দে □ উপ-অধিকর্তা, নদী বিজ্ঞান মন্দির, সেচ ও জলপথ দপ্তর

কলকাতা ব্যবহৃত পাম্পিং স্টেশনগুলির রক্ষণাবেক্ষণের দায়িত্ব

ক্র. নং	নিকাশি পাম্পিং স্টেশন	ক্ষমতা ঘনফুট/সে.	রক্ষণাবেক্ষণের দায়িত্বে
০১।	বীরপাড়া পাম্পিং স্টেশন	৫০.০০	কলকাতা নগরপালিকা নিগম
০২।	লেকটাউন পাম্পিং স্টেশন	২৩.৭৭	জনস্বাস্থ্য ও কারিগরি বিভাগ
০৩।	দত্তবাগান পাম্পিং স্টেশন	৪৮	"
০৪।	বেলগাছিয়া পাম্পিং স্টোন	৮.০১	কলকাতা নগরপালিকা নিগম
০৫।	উল্টোডাঙ্গা (পুরান) পাম্পিং স্টেশন	২৮	"
০৬।	উল্টোডঙ্গা (নতুন) পাম্পিং স্টেশন	৪৪০	"
০৭।	মানিকতলা সাইফন পাম্পিং স্টেশন	২৪	"
০৮।	মানিকতলা পাম্পিং স্টেশন	৯৭	"
০৯।	ধাপালক পাম্পিং স্টেশন	৪৮০	"
১০।	কাশীপুর দমদম নিকাশি পাম্পিং স্টেশন	১৫৬	জনস্বাস্থ্য ও কারিগরী বিভাগ
১১।	পামার বাজার পাম্পিং স্টেশন	১১৮৪	কলকাতা নগরপালিকা নিগম
১২।	পাগলাডাঙ্গা পাম্পিং স্টেশন	৪৮	"
১৩।	ঠনঠনিয়া পাম্পিং স্টেশন	—	"
১৪।	চিংড়িঘাটা পাম্পিং স্টেশন	১০০	সি. এম. ডাব্লু. এস. এ
১৫।	কুলিয়া ট্যাংরা পাম্পিং স্টেশন	৪০	কলকাতা নগরপালিকা নিগম
১৬।	তপসিয়া (পুরান) পাম্পিং স্টেশন	৬৫	"
১৭।	বালিগঞ্জ নিকাশি পাম্পিং স্টেশন	১২৩৩	"
১৮।	চৌভাগা (পুরান) পাম্পিং স্টেশন	৪৫০	সেচ ও জলপথ বিভাগ
১৯।	চৌভাগা (অতিরিক্ত) পাম্পিং স্টেশন	৫০০	"
২০।	চৌভাগা (দ্বিতীয় অতিরিক্ত) পাম্পিং স্টেশন	৫০০	"
২১।	যোধপুব পার্ক পাম্পিং স্টেশন	২৫.৬৪	কলকাতা নগরপালিকা নিগম
২২।	চেতলা লক পাম্পিং স্টেশন	২৪	"
২৩।	কেওড়াপুকুর পাম্পিং স্টেশন	২০০	সেচ ও জলপথ বিভাগ
২৪।	নিমকমহল পাম্পিং স্টেশন	১২	কলকাতা নগরপালিকা নিগম
২৫।	মোমিনপুর পাম্পিং স্টেশন	১৪২	"
২৬।	বরানগর নোয়াপাড়া পাম্পিং স্টেশন	৩০০	কলকাতা মহানগর উন্নয়ন পরিষদ

বিশ্ববিচিত্রা

অঞ্জন দাশগুপ্ত

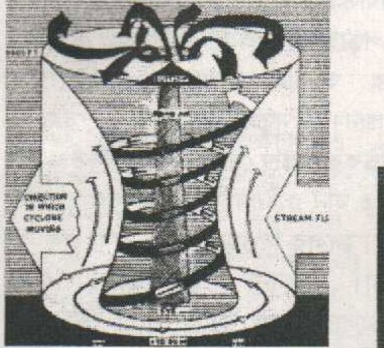

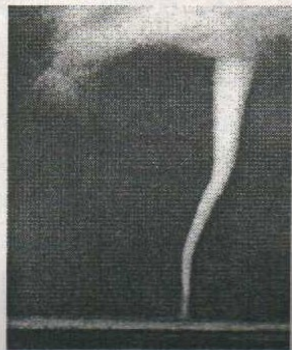

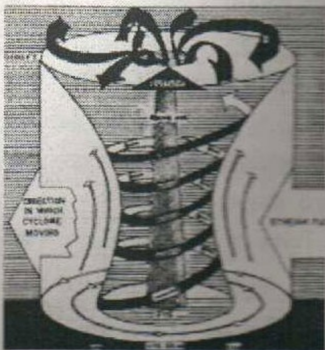

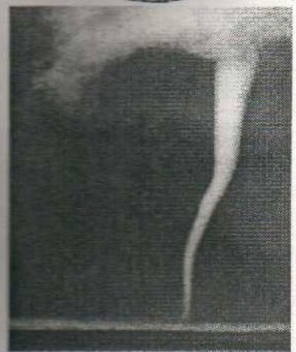

সুদূর অতীতে খুঁজে পাওয়া সেচ ব্যবস্থা

দক্ষিণ আমেরিকার অতি ইতিহাসপ্রসিদ্ধ দেশ পেরু। আনুমানিক ১২০০ খ্রিস্টাব্দে এখানে সুসভ্য ইনকা সভ্যতা গড়ে ওঠার মাধ্যমে এখানে বিকশিত হয়ে ওঠে এক বিরাট সংস্কৃতি। কিন্তু ষোড়শ শতকে স্পেনীয় আক্রমণে এই সভ্যতা ধূলিসাৎ হয়ে যায়। এরও অনেক আগে আনুমানিক ১৫০ থেকে ৭০০ খ্রিস্টাব্দে রাজধানী লিমার অনেক উত্তরে ছিল অতি উন্নত মোচে নগরকেন্দ্রিক সভ্যতা। আন্দ্রিস পর্বতের পূর্বদিকে অবস্থিত এই স্থান অতি শুষ্ক, বিশেষ করে বৃষ্টিচ্ছায়া (Rain shadow) অঞ্চলের অন্তর্গত। কিন্তু নগরকেন্দ্রিক এই সভ্যতার নিদর্শন হিসেবে আবিষ্কৃত হয়েছে বহু বাগান, পার্ক, ধাপে ধাপে চাষ ইত্যাদি। আন্দ্রিস পর্বত থেকে উৎপন্ন মোচে ও তার শাখা ও ছোটো ছোটো উপনদীর জল ব্যবহার করে খালের সাহায্যে বিস্তীর্ণ অঞ্চলে সেচের জল সরবরাহ করা হত। সেচের প্রভাবে মোচে অববাহিকা অঞ্চল ফসলে সমৃদ্ধ হয়েছিল। এখনও এই অঞ্চলের স্থানে স্থানে নিদর্শন হিসেবে রয়ে গেছে অসংখ্য খাল, অ্যাকুইডাক্ট ইত্যাদি। জল পরিবাহী এই সব খাল অনেক স্থানেই ছিল যথেষ্ট চওড়া। এই সুদীর্ঘ খালগুলো এখনও এখানের সু-উন্নত সভ্যতার সাক্ষ্য বহন করছে।

বন্যাপ্রবণ ইতালির পো নদী অববাহিকা

ইতালির উত্তর দিক দিয়ে প্রবাহিত পো-নদী অববাহিকা অঞ্চল একদিক দিয়ে অত্যন্ত সমৃদ্ধ আবার অন্য দিকে বন্যার জন্য নিয়ে আসে অনেক দুর্দশা। আলপ্‌স ও আপেনাইন পর্বতমালার মধ্যে প্রসারিত পো-নদীর অববাহিকা ইতালির প্রায় এক চতুর্থাংশ স্থান অধিকার করে আছে। ১৪১টি উপনদীর জলে সমৃদ্ধ প্রায় ৭০,০০০ বর্গ কিমি. অববাহিকার আয়তন বিশিষ্ট এই নদী আলপ্‌স পর্বত থেকে বেরিয়ে ৬৫০ কিমি. পথ অতিক্রম করে আড্রিয়াটিক সাগরে গিয়ে পড়ে। নদী কোনো কোনো স্থানে ৫০০ মিটারের উপরে চওড়া। নদী অববাহিকা খুবই উর্বর। ইতালির শিল্পসমৃদ্ধ তুরিন শহর, বিশাল মহানগরী মিলান-এর অবস্থিতি এই অববাহিকায়। বিভিন্ন প্রকার ফল ছাড়া কৃষিজাত পণ্য যেমন গম, ভুট্টার প্রভৃত চাষ হয়। নদীটি তাই ইতালিতে এনে দিয়েছে বিশাল সমৃদ্ধি, কিন্তু পাহাড় থেকে বয়ে আনা পাথর এবং পলিনদীর বুকে সঞ্চারিত হয়ে প্রায়শই বন্যা দেখা দেয়। নদী থেকে প্রতি বছর প্রচুর পরিমাণে নুড়ি পাথর ও বালি তুলে নেওয়া হয় অত্যন্ত লাগামহীন ভাবে। প্রাকৃতিক ভারসাম্য তাই বজায় না থাকায় নদী প্রায়শই তার গতি পরিবর্তন করে এবং বন্যা দেখা দেয়। প্রভূত পরিমাণে পলি সঞ্চারের ফলে পার্শ্ববর্তী জমি থেকে নদীর তলদেশের উচ্চতা অনেক স্থানেই উঁচু। এ ব্যাপারে একটি স্থানীয় কথা খুবই প্রচলিত—"where the birds live lower than the fish"। দুদিকের জমিকে বন্যার হাত থেকে বাঁচাতে তাই নির্মিত হয়েছে মাটির বাঁধ ইতালিয় ভাষার যাকে বলা হয় Argini। নদীর জলতল উঠে যাওয়ায় বাঁধ ভেঙে প্রায়ই বন্যা দেখা দেয়। সমুদ্রে পড়বার আগে নদীর গতিবেগ মন্থর হয়ে যাওয়ায় সৃষ্ট হয়েছে ব-দ্বীপ অঞ্চলের। এখানের অবস্থা অত্যন্ত সঙ্গীন। ক্রমাগত মিথেল উৎপাদনের ফলে ব-দ্বীপ অঞ্চলের ভূমি অনেক জায়গাতেই সমুদ্রতলের থেকে ২/৩ মিটার নীচু। এই সকল স্থানকেও বাঁচাতে দেওয়া হয়েছে মাটির বাঁধ। তবে বন্যার আশঙ্কা থেকেই যায়। ইতালি সরকার তাই পো-অববাহিকাকে বাঁচাতে নিচ্ছে বিভিন্ন পদক্ষেপ।

সংকলন : অঞ্জন দাশগুপ্ত ❑ *অবসরপ্রাপ্ত মুখ্য বাস্তুকার, সেচ ও জলপথ দপ্তর*

ঐতিহ্যপূর্ণ সুন্দরবন ও তার রক্ষণাবেক্ষণ

দিলীপ কর্মকার

নদীর পাড়ে তোরণ : বনবিবি উৎসব / সুন্দরবন *ছবি : দিলীপ কর্মকার*

পশ্চিমবঙ্গে তিন তিনটি উল্লেখযোগ্য নদীর অববাহিকা বর্তমান। ব্রহ্মপুত্র অববাহিকা, গঙ্গা অববাহিকা ও সুবর্ণরেখা অববাহিকা। এই তিনটি অববাহিকার মধ্যে গঙ্গা অববাহিকাই বৃহৎ। উত্তরাঞ্চলের অধিক্ষেত্রে অবস্থিত হিমালয়ের গোমুখ থেকে এর উৎপত্তি। এরপর বিভিন্ন পথ ধরে উত্তরপ্রদেশের মধ্য দিয়ে প্রবাহিত হয়ে গঙ্গা অববাহিকা বিহার রাজ্যে প্রবেশ করেছে। প্রবাহিত হয়েছে এই রাজ্যের বিভিন্ন স্থান ছুঁয়ে। অবশেষে পশ্চিমবঙ্গের বিভিন্ন স্থান অতিক্রম করে মিলিত হচ্ছে বঙ্গোপোসাগরে। যুগ যুগ ধরে বয়ে চলেছে গঙ্গা অববাহিকা। কোনো স্থানে এই অববাহিকার নামকরণ হয়েছে গঙ্গা, কোথাও ভাগীরথী, আবার কোথাও হুগলি নদী। সভ্যতার অগ্রগতিতে বহু ছোটো-বড় নগর গড়ে উঠেছে এই অববাহিকার দুই পাড়ে।

পৌরাণিক কাহিনিতে বর্ণিত আছে প্রাচীনকালে দানধ্যানকারী, সৎ বিচক্ষণ রাজা দিলীপের পুত্র ভগীরথ ধ্যানযোগে কৈলাসপতি শিবকে সন্তুষ্ট করেন। তুষ্ঠ শিব তাকে বর প্রদান করতে চান। মর্তবাসীর কল্যাণের জন্য গঙ্গাদেবীকে মর্তে নিয়ে আসার নিরিক্ষে ভগীরথ বর চান। অবশেষে শিবের সম্মতিতে তার জটা থেকে উৎপন্ন গঙ্গাদেবীকে এই মর্তধামে নিয়ে আসেন। বর্ণিত আছে শঙ্খধ্বনি করে ভগীরথ যে পথ ধরে মর্তলোকে অগ্রসর হয়েছিলেন তার পিছু পিছুই গঙ্গাদেবী এসেছেন এবং প্রবাহিত হয়েছেন। পৌরাণিক কাহিনি যাই হোক হিমালয়ের শৃঙ্গ থেকে প্রবাহমান গঙ্গা যুগ যুগ ধরে বয়ে চলেছে আপন গতিতে। এর বিভিন্ন স্থানে বিভিন্ন রূপ। অপূর্ব শোভায় শোভিত প্রকৃতির মাঝে গোমুখ থেকে প্রবাহিত হয়ে উত্তরাঞ্চলে হরিদ্বারের কাছে গঙ্গার এক রূপ। এখানে গঙ্গা অবিরাম কল কল শব্দে এক দুরন্ত কিশোরীর মত ছুটে চলেছে। এখানে গঙ্গার স্বচ্ছতা এতই যে, তলের নুড়ি পাথর পর্যন্ত স্পষ্ট দেখা যায়। মনে হয় নিস্পাপ, নিরঅহংকারী এক কিশোরী শুধু ছুটছে আর ছুটছে আপন মনে আপন গতিতে। উত্তরপ্রদেশের বেনারসে আবার গঙ্গার রূপ ভিন্ন। এখানে দুই কুল ছাপিয়ে গঙ্গা প্রকৃতির সকল বস্তুকে দেখতে চায়। এখানে যেন তার ভরা যৌবনের রূপ। দুই ধারের অসংখ্য মন্দিরের শাঁখ, কাঁসর ও ঘণ্টাধ্বনিতে দিবা রাত্রি গঙ্গা বন্দিত। এই স্থানে গঙ্গা, দিনের বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন সাজে সজ্জিত হয়ে, অপূর্ব ছন্দে বয়ে

চলেছে। আবার বিহারের শেষাংশে ও পশ্চিমবঙ্গে প্রবাহের স্থানে গঙ্গার অন্য রূপ। এখানে এক কূল থেকে অন্য পার্শ্বের কূলের দূরত্ব অনেকটা। শান্ত, ধীর স্থির, ভরপুর গঙ্গার পূর্ণগর্ভার রূপ। এখানে গঙ্গা ধীর গতিতে প্রবাহিত। মালদার কাছে গঙ্গার মূল ধারা প্রতিবেশী রাষ্ট্র বাংলাদেশের অভিমুখে প্রবাহিত হলেও পশ্চিমবঙ্গের অংশ ভাগীরথী নদী ও পরে হুগলি নদী নামে প্রবাহিত হয়ে সমুদ্রের সঙ্গে যুক্ত হয়েছে। বঙ্গের শেষাংশে গঙ্গার প্রৌঢ়ত্বের রূপ। বহু নাতি-নাতনি বেষ্টিত হয়ে দিবারাত আমোদ আহ্লাদে রত থেকে মহাসমুদ্রে বিলিনের দৃশ্য। গঙ্গার এই অসংখ্য নাতি-নাতনির দ্বারাই সৃষ্ট পশ্চিমবঙ্গের ঐতিহ্যপূর্ণ ব-দ্বীপ অঞ্চল 'সুন্দরবন।' শিশুরা যেমন সৌন্দর্যের প্রতীক, সেরকম অপূর্ব সাজে সজ্জিত প্রকৃতির মাঝে এই সুন্দরবন অঞ্চল। একদিকে যেমন আছে বহু ছোটোবড় নদী, আবার আছে অসংখ্য নালা আর খাঁড়ি। একধারে আছে সবুজ বনাঞ্চল, অন্যদিকে আছে জনমানবের বসবাসের ভূমি। এখানে প্রকৃতির অরণ্যর মাঝে আছে বন্যপ্রাণী, জলে আছে জলজ প্রাণী, সব দিক থেকে এখানকার শোভা অনন্য। একই সঙ্গে বলা যায় সার্থক নামকরণ এই ব-দ্বীপ অঞ্চলের 'সুন্দরবন।'

যুগ যুগ ধরে একটু একটু করে পলিমাটি জমে বঙ্গোপোসাগরের উপকূল সন্নিকটে গড়ে উঠেছে এই সুন্দরবন অঞ্চল। ছোটো বড় অনেক ব-দ্বীপের সমাহার এখানে। এই ব-দ্বীপগুলি সীমায়িত হয়েছে ছোটো বড় নদী, নালা ও খাঁড়ির মাধ্যমে। এখানে আছে মুক্ত সবুজ অরণ্য সম্পদ যা দেশ বিদেশের মানুষের কাছে অতি আকর্ষনীয়। সুন্দরবন অঞ্চল পৃথিবীর বৃহত্তম ব-দ্বীপ। এখানে রয়েছে অসংখ্য নদী। এর মধ্যে উল্লেখযোগ্য নদীসমূহ বিদ্যাধরী, রায়মঙ্গল, হেড়োভাঙ্গা, ইছামতী, বিদ্যা, ঠাকুরণ, মাতলা, গোমর, হানা, বড়তলা, সপ্তমুখী পিয়ালী, হোগল, গোসাবা, করতাল, মুড়িগঙ্গা, কলাগাছিয়া ইত্যাদি ইত্যাদি। আয়তনে ছোট বড় সব মিলিয়ে ব-দ্বীপের সংখ্যা ১০২টি। কিন্তু সবকটি দ্বীপে জনবসতি নেই। সুদূর অতীতে এলাকার নদীগুলিতে প্রকৃতির নিয়মে জোয়ার ভাঁটার জলের গতি ছিল অবাধ একটু একটু করে, স্তরে স্তরে পলি জমে মাথা উঁচু করে দাঁড়িয়েছে এই দ্বীপ সমূহ। সেই সময় জোয়ারের জলের উচ্চতা বৃদ্ধিতে ব-দ্বীপগুলি প্লাবিত হত। ১৭৭০ খ্রিঃ ইংরেজ আমলে ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির কালেক্টর জেনারেল মিঃ সি. রাসেল প্রথম এই সুন্দরবন এলাকার একটি দ্বীপে পরীক্ষামূলক ভাবে মাটি দিয়ে ঘের বাঁধ তৈরি করে অবাদের সূচনা করেন। এই প্রয়াস সফল হওয়ায় পরবর্তীকালে মানব জাতির ঐকান্তিক ইচ্ছায় ও প্রচেষ্টায় একের পর এক দ্বীপে মাটি দিয়ে ঘের বাঁধ তৈরি হয়। গড়ে তোলে বসবাস উপোযোগী স্থান। অন্যদিকে ক্রমশ জনসংখ্যার বৃদ্ধিতে ও তাদের স্থান সংকুলানের চাহিদাক্রমে ওই স্থানে গড়ে ওঠে জনবসতি। এযাবৎ কাল ৫৪টি দ্বীপে জনবসতি গড়ে উঠেছে। এখানকার জমি খুব উর্বরা। এত বৃহৎ আয়তনের উর্বরা ব-দ্বীপ অঞ্চল পৃথিবীর অন্য কোথাও নেই। যখন কোন জনবসতি গড়ে উঠেনি, তখন সমগ্র সুন্দরবন অঞ্চলই ছিল অরণ্যে ঘেরা। এই সুন্দরবন অঞ্চল চিহ্নিত হয়েছিল ড্যাম্পিয়ার-হজেস রেখা দ্বারা। অঞ্চলের জরিপের কাজ শুরু হয়েছিল ১৮২২ খ্রিঃ মিঃ এনসাইন প্রিন্সেপ-এর উদ্যোগে এবং শেষ হয়েছিল ১৮৩০ খ্রিঃ, যখন কমিশনার ছিলেন মিঃ উইলিয়াম ড্যাম্পিয়ার। জরিপের কাজটি করেছিলেন সার্ভেয়ার লেফটলেন্ট হজেস। তাই তাদের নামানুসারে ওই সীমারেখার নামকরণ হয়েছিল ড্যাম্পিয়ার-হজেস সীমারেখা।

বর্তমানে পশ্চিমবঙ্গের দুটি জেলার মোট ১৯টি ব্লক নিয়ে গঠিত সুন্দরবন এলাকা। উত্তর ২৪ পরগনা জেলার ৬টি ব্লক ও দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলার ১৩টি ব্লকের অন্তর্গত। অবিভক্ত ভারতবর্ষে সুন্দরবন ছিল ২১০০০ বর্গ কিমি। স্বাধীনতার পর দেশ ভাগের মধ্য দিয়ে ভারতবর্ষে সুন্দরবনের আয়তন অনেকটাই কমে যায়। এই বৈচিত্র্যময় অরণ্যের উনবিংশ শতাব্দীর প্রথমভাগে জরিপ অনুসারে আয়তন হলো ৯৬৩০ বর্গ কিমি। যে সমস্ত দ্বীপে জনবসতি বর্তমান, সেই দ্বীপসমূহে চাষযোগ্য এলাকা প্রায় ২৫৬০ বর্গ কিমি, আর বাদাবন ৪২৬৪ বর্গ কিমি। এই বাদাবনের আয়তন সমগ্র ভারতবর্ষের বিভিন্ন প্রান্তের অবস্থিত মোট বাদাবনের ৬০ শতাংশেরও বেশি। এখানে সংরক্ষিত অরণ্য এলাকা বিদ্যমান। এই সংরক্ষিত অরণ্য এলাকাতে আছে হেঁতাল, গরান, বাইন, গেঁওয়া, সুন্দরী, খলসে ইত্যাদি গাছগাছালি যা সুন্দরবনকে করেছে রূপসী। এখানে প্রকৃতির মাঝে বাঘের বাস। এখানে আছে ব্যাঘ্র প্রকল্প। সুন্দরবনের জীবভৌগলিক পরিবেশের গুরুত্ব উপলব্ধি করে ব্যাঘ্র-প্রকল্পের চিহ্নিত জাতীয় উদ্যান ১৯৮৫ সালে ওয়ার্ল্ড ন্যাচারাল হেরিটেজ সাইটস-এর তালিকাভুক্ত হয়েছে। এখানে জীব বৈচিত্র্য ভরপুর। আছে রয়েল বেঙ্গল টাইগার যা বিশ্বে আর কোথাও মেলে না। আছে বন্যবরাহ, চিতল হরিণ। এছাড়া আছে নানা ধরনের পাখি, ডাঁস মৌমাছি, জলে কুমির, শুশুক, হাঙর, কচ্ছপ ভোঁদড়, বাগদা চিংড়ি ও অন্য নানা ধরনের মাছ ও বালিকাঠা ইত্যাদি। প্রাকৃতিক পরিবেশের ভারসাম্য রক্ষায় এখানকার অন্যান্য জীব পরিবেশ ও জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণ অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। প্রাকৃতিক বিভিন্ন বিষয়ে, নতুন আবিষ্কারের লক্ষ্যে তথ্য সংগ্রহ, জ্ঞানের অনুসন্ধানে ধারাবাহিকতা রাখার জন্যে সুন্দরবন অঞ্চলে উপযুক্ত ক্ষেত্র হিসেবে চিহ্নিত হয়েছে। এখানে ১৬৫ কিমি দৈর্ঘ্য সমুদ্রতটভূমি। প্রায় ৪০ লক্ষ মানুষের বাস সুন্দরবনের বিভিন্ন দ্বীপে। আবাদি জমি চাষবাস, মৎস্যচাষ, নদীর জল থেকে মাছের চারা (মিন) ধরা, বন থেকে মধু সংগ্রহ করা ইত্যাদি এলাকার মানুষের প্রধান জীবিকা। ইদানিং কোনো কোনো স্থানে পর্যটন শিল্প, হস্ত ও কুটির শিল্পকেন্দ্রের সূচনা হয়েছে। সময়ে চাহিদাক্রমে এই এলাকাতে বিভিন্ন শিল্প স্থাপনের সম্ভাবনাও প্রবল।

জনবসতি, চাষবাস বা শিল্প স্থাপন সবারই সূচনা হয়েছিল ব-দ্বীপগুলিকে মাটি দিয়ে ঘের বাঁধের মাধ্যমে নদীর জোয়ারের জল থেকে রক্ষা করার মধ্য দিয়ে। বিভিন্ন দ্বীপের মাটির বাঁধের দৈর্ঘ্য মোট ৩৫০০ কিমি। এর মধ্যে ৭৫০ কিমি মাটির বাঁধ উত্তর ২৪ পরগনা জেলাতে অবস্থিত দ্বীপসমূহে। বাকি দৈর্ঘ্যের বাঁধের সবটাই দক্ষিণ ২৪-পরগনার দ্বীপগুলিতে। দ্বীপসমূহের বর্জ্য জল ও অতিরিক্ত বৃষ্টির জল নিকাশির জন্য মোট ৯৮০টি স্লুইস গেট আছে। ভারতবর্ষের স্বাধীনতার পূর্ববর্তীকালে এই অঞ্চলের নদীবাঁধ বা ঘেরবাঁধ সমূহ ছিল জমিদারদের দখলে। ওই সকল বাঁধের রক্ষণাবেক্ষণও ছিল তাদেরই তত্ত্বাবধানে। ১৯৫৪ সালে জমিদারি প্রথার বিলোপ ঘটে।

বিদ্যা নদী / সুন্দরবন *ছবি : দিলীপ কর্মকার*

পরবর্তীকালে সুন্দরবনের সমগ্র নদীবাঁধ রাজ্যসরকার অধিগ্রহণ করে এবং তা সঠিক রক্ষণাবেক্ষণের জন্যে সেচ ও জলপথ বিভাগের আওতায় আসে। বঙ্গোপোসাগরের উপকূলে অবস্থানের ফলে সাগরে উদ্ভুত নিম্নচাপের প্রভাব এই অঞ্চলে পড়ে। প্রায় প্রত্যেক বছরেই এখানে ঝড়ঝঞ্ঝা হয়ে থাকে। তথ্য থেকে জানা যায় সাধারণত ঘণ্টায় ৩৫ কিমি গতিবেগ থেকে ১১০ কিমি গতিবেগ পর্যন্ত ঝড়ো হাওয়া এই সকল এলাকা দিয়ে বয়ে যায়। বিশেষ উল্লেখযোগ্য তথ্য হল ১৯৪২ সালে অক্টোবর মাসে সব থেকে প্রবলতম ঝড় বয়ে গেছে এই সুন্দরবন অঞ্চলে। ওই ঝড়ের গতিবেগ ছিল ঘণ্টায় ১৬৫ কিমি। এই সব ঝড়ো হাওয়ার জন্য সাধারণত জলস্ফীতি ঘটে থাকে। ব-দ্বীপ পরিবৃত্ত মাটির বাঁধ বহু জায়গায় আংশিক বা পূর্ণ ক্ষতিগ্রস্থ হয় এই জলস্ফীতিতে। এমনকি অনেক সময় মুহূর্তের মধ্যে নদীর নোনা জল চাষের জমিকে প্লাবিত করে চাষের ক্ষতি করে।

এই সব ঝড়ঝঞ্ঝা, জলস্ফীতি থেকে জনজীবনকে স্বাভাবিক ও সচল রাখতে নদী বাঁধের সঠিক সংরক্ষণ ও সময়ে তার রক্ষণাবেক্ষণের প্রয়োজন সর্বাধিক। সেচ ও জলপথ দপ্তর নিরলস প্রয়াস চালাচ্ছে এই কাজ সুষ্ঠভাবে পালন করতে। সুন্দরবনের বিভিন্ন দ্বীপে যাতায়াতের বা যোগাযোগের পথ নদীনালা। আবার দ্বীপগুলি নদীর করাল গ্রাসে যাতে না পড়ে সেই লক্ষে ধারাবাহিক ভাবে বিভিন্ন প্রযুক্তিতে স্থানপোযুক্ত রক্ষণাবেক্ষণের কাজ করে থাকে দপ্তরের ওই সমস্ত অঞ্চলের কর্মচারীরা। দ্বীপের আভ্যন্তরীণ সমস্যা সমাধানের লক্ষেও ভিন্ন ভিন্ন ধরনের কাজ করা হয়ে থাকে। দ্বীপগুলি যেহেতু ঘের বাঁধ দ্বারা বেষ্টিত তাই ওই স্থানের বৃষ্টির অতিরিক্ত জল নিকাশির জন্যে ও জনজীবনের ব্যবহৃত বর্জ্যজল নিকাশির জন্যে, নতুন স্লুইস গেট নির্মাণ ও নির্মিত স্লুইস গেটগুলির সঠিক রক্ষণাবেক্ষণের কাজ করা হয়। নদীর জলের ঢেউ তীব্রতা বা ক্ষিপ্রতার সঙ্গে যখন মাটির বাঁধে আছড়ে পড়ে তখন ওই বাঁধের ক্ষতি হয়ে থাকে। আবার কোনো কোনো সময় জোয়ারে জলের উচ্চতা অস্বাভাবিক বৃদ্ধির জন্যে বাঁধ উপচে নদীর নোনা জল মাঠে ঢোকে। এই সকল নিয়ন্ত্রণ ও রক্ষণাবেক্ষণের কাজ করা হয়। যেহেতু এখানকার সমস্ত নদী-নালাই জোয়ার ভাটার নদী ও সমুদ্রের কাছাকাছি এদের অবস্থান তাই এই নদীসমূহে নোনা জলের স্রোত প্রবল। এই স্রোতের তীব্রতার কারণে নদীর তলে মাটি ক্ষয়ে যায়। এর ফলে সংলগ্ন নদীর চর এমনকি সংলগ্ন মাটির বাঁধ বসে যায়। আবার নদী তার আপন গতিতে বইতে থাকলেও অনেক সময় তার গতিপথ পরিবর্তনের চেষ্টা করে। এই নদীর তলের ক্ষয় রোধে ও পূর্বের গতিপথে স্বাভাবিক ভাবে থাকার জন্যে যথোপোযুক্ত রক্ষণাবেক্ষণের কাজও করা হয়ে থাকে। প্রকৃতির আবহাওয়ার পরিবর্তনে, তীব্র ঝড়ো হাওয়া বা সাইক্লোনিক আবহাওয়ার সৃষ্টিতে জোয়ারের জলের তীব্র ঝাপটায় মাটির বাঁধ ভেঙে নদীর নোনাজল গ্রামে বা লোকালয়ে ঢুকে প্লাবিত করে। সেই সময় যুদ্ধকালীন

ভিত্তিতে ওই বাঁধের পুনর্নির্মাণের কাজও করা হয়। প্রয়োজনে বাঁধ স্বস্থানে পুনর্নির্মাণ করা হয় অথবা কিছুটা পিছু হটে রিং আকারে বাঁধ নির্মাণ করা হয়। মূলত এই সকল বিভিন্ন ধরনের কাজ দীর্ঘ দিনের অভিজ্ঞতা ও প্রযুক্তিগত দক্ষতার সঙ্গে সঠিক ভাবে সঠিক সময়ে, বছরের প্রায় সকল সময়ই কম বেশি করা হয়। সঙ্গে রাখতে হয় সারা বছরে সঠিক নজরদারি। সাধারণত যে সব বস্তু এই সকল এলাকাতে সহজলভ্য ও কম দামের, সেই সব বস্তুর ব্যবহার করেই এই এলাকার বেশিরভাগ রক্ষণাবেক্ষণের কাজ করা হয়। নদীর গতিপথ ঠিক রাখার জন্যে প্রয়োজনে ব্যবহার করা হয় তারজালির মধ্যে ইটভর্তি করে সসেস, বাঁশ দিয়ে তৈরি বিভিন্ন মাপের ইট ভর্তি পক্প্যাইন খাঁচা (Porcupine cages) ইত্যাদি। এইগুলি নদীর মধ্যে সঠিক স্থানে নিক্ষেপ করে নিয়ন্ত্রণ করা হয়। অনেক সময় গভীর খাদ মেরামতের জন্য ব্যবহৃত হয় লম্বা ঝাড় বাঁশের সঙ্গে ভারি বস্তু যুক্ত করে, যাকে ট্রেটাপট বলা হয়। জলের ঢেউ ও ঝাপটা থেকে মাটির বাঁধকে রক্ষণার জন্য ব্যবহৃত হয় ইটের পিচিং। আবার সাময়িক প্রতিকারের জন্য ব্যবহার করা হয় বাঁশের বা দরমার বেড়া যা, বাঁধের উপর অর্ধ বাঁশ দিয়ে চাপান দিয়ে ব্যবস্থা নেওয়া হয়। এতদ্‌সত্ত্বেও এখানকার নদীসমূহের গতিপ্রকৃতি বোঝা ভার। কোনো কোনো জায়গায় নদীর তলদেশ ক্ষয়প্রাপ্ত হয়ে, সংলগ্ন মাটির বাঁধ বসে যায়। এই সময় জনজীবন, চাষজমি বাঁচাবার তাগিদে ততক্ষণাৎ সিমেন্টের ব্যাগে বালি বা মাটি ভর্তি করে বাঁধের মাথাতে চাপিয়ে বাঁধ রক্ষা করা হয়। আসলে, এখানে বছরের এক এক ঋতুতে নদী-নালার চেহারা এক এক রকম। বর্ষাকালে নদী-নালা জলে টইটম্বুর থাকে ও এই সময়ে বাঁধ ভাঙার প্রবণতাও থাকে বেশি, আবার শীতকালে একই নদী-নালা দেখে অনুধাবন করাই যায় না বর্ষার রূপ। প্রকৃতির খেয়াল খুশিকে মানিয়ে নিয়েই সবরকম পরিস্থিতিতে কাজ করতে হয় দপ্তরের দায়িত্বপ্রাপ্ত সকলকেই।

সুন্দরবনের বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন অবস্থার প্রভাব পরে সেখানকার জনগণের উপর। নৈসর্গিক প্রকৃতিকে যেমন তারা উপভোগ করতে পারেন, বিচরণ করেন আপন ইচ্ছায়, তেমনি প্রকৃতির একটু আধটু খামখেয়ালিপনার অসুবিধাও ভোগ করতে হয় এখানকার জনগণকে। সমস্ত অনুকূল বা প্রতিকূলতার মধ্যেও সুন্দরবনের জনজীবনকে উন্নততর জীবনযাত্রায় পৌঁছে দেবার সংকল্পে সরকারি উদ্যোগ অব্যাহত। পরিবেশকে নির্মল ও সঠিক মানে রেখে পরিকাঠামো উন্নতির জন্য সরকারি প্রচেষ্টার এই প্রয়াসে সহযোগিতার প্রশ্নে ধারাবাহিকভাবে হাত বাড়িয়ে দিতে হবে সুন্দরবন এলাকার সকল বুদ্ধিদীপ্ত মানুষ ও গণ সংগঠনগুলিদের। প্রকৃতির এই অপার সৌন্দর্যসম্ভার সঠিকভাবে মানুষের কল্যাণে ব্যবহার করা ও অক্ষুণ্ণ রাখার নিরিখে সমস্ত প্রয়াসকে আগামি দিনে সার্থক রূপদানের লক্ষ্যে এই অঞ্চলের সব মানুষকে ভালোবাসতে হবে তাদের প্রিয় সুন্দরবনকে। যত্ন ও রক্ষা করতে হবে প্রকৃতির দানকে, আগামি দিনে মানব সমাজের কল্যাণ কামনায়।

দিলীপ কর্মকার ❑ *অবর সহ বাস্তুকার, সেচ ও জলপথ দপ্তর*

বিজ্ঞপ্তি

ভারত সরকারের সংবাদপত্র রেজিস্ট্রেশন নিয়মাবলীর (১৯৫৬) ধারা অনুযায়ী নিম্নলিখিত তথ্যগুলি প্রকাশ করা হল :

(ক)	*পত্রিকার নাম*	:	সেচপত্র
(খ)	*পত্রিকার ভাষা*	:	বাংলা
(গ)	*প্রকাশের স্থান*	:	জলসম্পদ ভবন, বিধাননগর, কলকাতা-৭০০ ০৯১
(ঘ)	*প্রকাশ কাল*	:	ত্রৈমাসিক
(ঙ)	*মুদ্রাকরের নাম*	:	সোমনাথ আ্যাগরওয়ালা
(চ)	*মুদ্রাকরের জাতি ও ঠিকানা*	:	ভারতীয়, জলসম্পদ ভবন, বিধাননগর, কলকাতা-৭০০ ০৯১
(ছ)	*প্রকাশকের নাম ও ঠিকানা*	:	সোমনাথ আগরওয়ালা, জলসম্পদ ভবন, বিধাননগর, কলকাতা-৭০০ ০৯১
(জ)	*সম্পাদকের নাম, জাতি ও ঠিকানা*	:	মৃণালেন্দু চট্টোপাধ্যায়, ভারতীয়, জলসম্পদ ভবন, বিধাননগর, কলকাতা-৭০০ ০৯১
(ঝ)	*স্বত্বাধিকারী*	:	সেচ ও জলপথ বিভাগ, পশ্চিমবঙ্গ সরকার
(ঞ)	*স্বত্বাধিকারীর ঠিকানা*	:	জলসম্পদ ভবন, বিধাননগর, কলকাতা-৭০০ ০৯১

আমি, সোমনাথ আগরওয়ালা এতদ্দ্বারা ঘোষণা করছি যে, উপরোক্ত তথ্যগুলি আমার জ্ঞান ও বিশ্বাস মতে সত্য।

স্বাক্ষর : সোমনাথ আগরওয়ালা

উন্নয়নের চিত্র

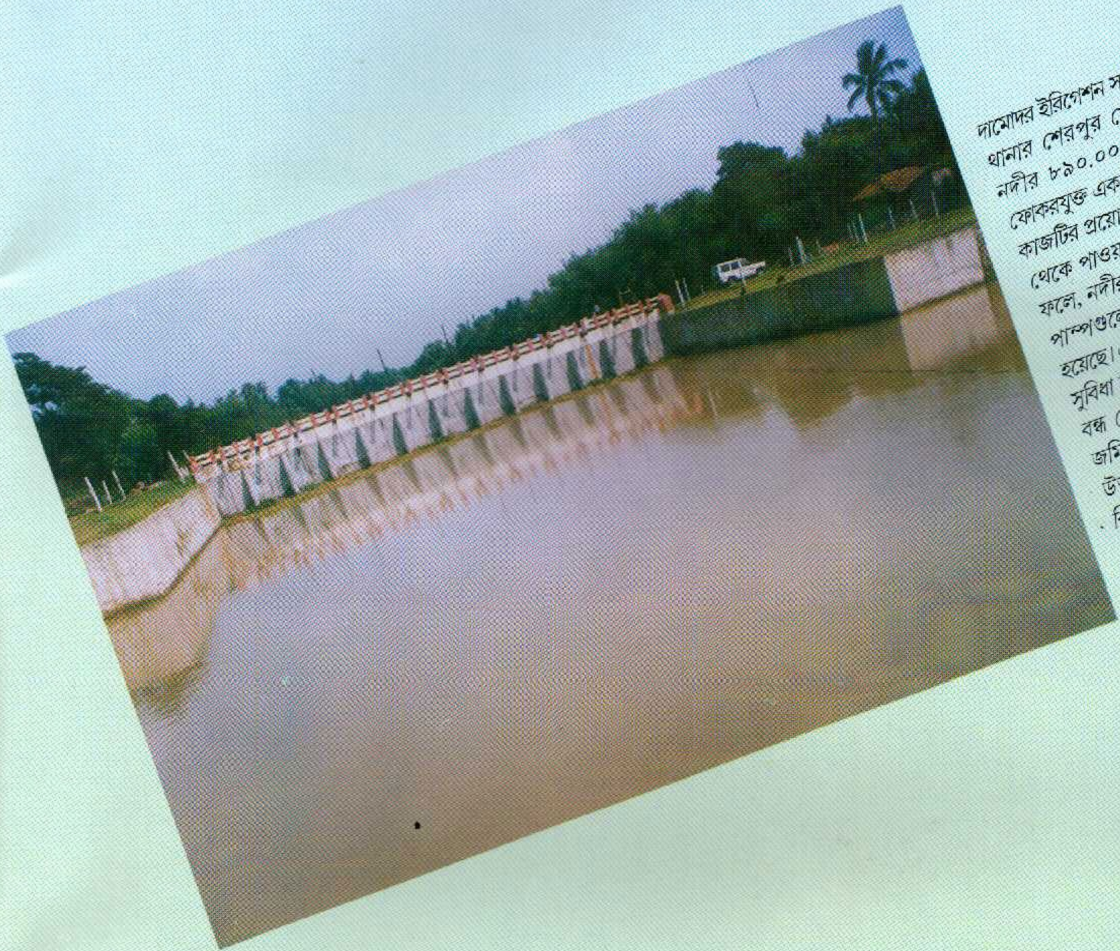

দামোদর ইরিগেশন সার্কেলের অধীনে বলাগড় থানার শেরপুর মৌজায়, লোয়ার বেহুলা নদীর ৮৯০.০০ চেন এ সম্প্রতি ১৩ টি ফোকরযুক্ত একটি স্লুইস গেট নির্মিত হয়েছে। কাজটির প্রয়োজনীয় টাকা নাবার্ড ষষ্ঠ পর্যায় থেকে পাওয়া গেছে। স্লুইস গেটটি নির্মাণের ফলে, নদীর উপর দিকের, আর, এল,আই, পাম্পগুলোর জল উত্তোলনের অসুবিধা দূর হয়েছে। এর ফলে চাষের জমিতে জল দেওয়ার সুবিধা হয়েছে। বিশেষত শুকনোর সময় গেট বন্ধ রেখে উপর দিক থেকে আসা চাষের জমির নিকাশি জল ধরে রেখে, বেহুলা নদীর উভয় তীরের জমিগুলোতে জল দেওয়ার বিশেষ সুবিধে হয়েছে।

দামোদর ইরিগেশন সার্কেলের অধীনে গ্রান্ট-ইন-এইড প্রকল্পে কানানদীর উপর ধনিয়াখালি থানার- মহরমপুর মৌজায়, রোডব্রিজ নির্মিত হয়েছে ২০০৩ সালে। এর ফলে কানানদীর উভয় দিকে অনেকগুলো গ্রামের যাতায়াতের সমস্যা মিটেছে। স্থানীয় জনসাধারণের চাহিদা এবং আগামীদিনে উন্নয়নের কথা মাথায় রেখেই রোডব্রিজটি আধুনিক নির্মাণ শৈলীতে তৈরি হয়েছে।

REGD. NO. WBBEN/2000/1027 OCTOBER - DECEMBER 2004